THE

CHERRY PRESS.

Printed by Rasik Lal Pan,

36, Machooabazar Road,

Published by Gooroodas Chatterjee,

201, Cornwallis Street,

CALCUTTA.

আষাঢ়ের একাদশী;—আকাশে এখানে ওখানে দুই এক-খানা বর্ষণক্লান্ত লঘুমেঘ দৃষ্ট হইতেছে। আকাশে একা-দশীর চন্দ্র তাহার অম্লানোজ্জ্বল কিরণ ঢালিতেছে; আর নিম্নে সেই চন্দ্রকরে প্রদীপ্ত জলঙ্গীর বারিরাশি বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাবারিপাতে চঞ্চলা জলঙ্গীর জলাঙ্গে 'ঢল' নামিয়াছে; সে জললীলা বড় মধুর, বড় মনোহর। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে, জলঙ্গীর জল এক দিকে প্রায় কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে; আর এক দিকে উচ্চ পাহাড়,—তৃণাদিবর্জ্জিত;—সেই পাহাড়ে বহুসংখ্য গাঙ্গেয় শালিকের আবাস-কোটর দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের দুই এক স্থান হইতে মৃত্তিকা ধসিয়া নদীজলে পড়িয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে, এবং সেই পতনস্থানে আবিল জলরাশি আরও আবিল করিয়া দিতেছে।

নবদ্বীপ হইতে একখানি পান্সী জলঙ্গীতে উজান বহিয়া আসিতেছে;—যাত্রী ছয় সাত জন যুবক। দশহরার সময় গৌরাঙ্গের জন্মভূমি, বৈষ্ণবদিগের পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে বহু জন-সমাগম হয়। নানা স্থান হইতে পুণ্যলাভ-প্রয়াসী হিন্দুগণ ঐ সময় নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপক্ষয় ও প[illegible] করিবার আশায় নবদ্বীপে সমাগত হইয়া থাকেন।

নৌকাযাত্রীরাও দশহরার সময় নবদ্বীপে গিয়াছিলেন,—পুণ্যলাভাশায় নহে,—দশহরার সময়ে নবদ্বীপের জনসমাগম দেখিতে। আজ তাঁহারা নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরে এক বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন; সেখান হইতে যে যাহার গৃহে যাইবেন।

নৌকামধ্যে নানা গল্প ও যুবজন-সুলভ উচ্চহাস্য চলিতেছিল। যুবকগণের মধ্যে কেবল এক জন গম্ভীর।

যুবকদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "কি বাঁচাটাই বাঁচা গিয়াছে! কাল্‌ রাত্রে যখন ঝড় উঠিল, তখনই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার পর যখন মাঝিরা বলিল যে, নৌকা সামাল করা দায়, তখন যে কি ভয় হইল, তাহা আর বলিতে পারি না। ভাবিলাম, স্ত্রীকে মনঃকষ্ট দিয়া আসার এই ফল। তোমাদের কি? তোমরা ত সাঁতার জান; মরিতে মরিতাম আমি আর অতুল।"

এক জন বলিল, "তা ত বটেই! আমরা বাঁচিলে তোমরাও বাঁচিতে; তোমাদের ফেলিয়া আমরা আর যাইতাম না।"

"ওহে কথাটা বলা যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ নহে। তখন মনে করিতে,—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ।'"

আর এক জন বলিল, "যা'ক্ বাপু [illegible]মর না[illegible]।

তোমার স্ত্রী ত আর বিধবা হ'ন নাই! এখন আর সে কথায় কাজ কি? এখন বল ত স্ত্রীকে কি মনঃকষ্ট দিয়া আসিয়াছ?"

এক জন বলিল, "বাহবা আশু! তুই সত্যই পাকা এটর্নি হইতে পারিবি। আসল কথাটা ভুলিস্ নাই।"

প্রথম বক্তা বলিল, "আর কি, গৃহিণী একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতে হুকুম করিয়াছিলেন। তা তোমরা তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবে না বলিয়া, তাহা আর হইল না।"

এক জন জিজ্ঞাসিল, "কেন, তোমার স্ত্রী কোথায়?"

"এমন বোকা ত দেখিনি! আমার বাড়ী থাকিলে ত দেখা হইতই। গৃহিণী এখন তাঁহার পিত্রালয়ে, অর্থাৎ আমার অসার খলু সংসারে সার শ্বশুরমন্দিরে।"

এই সময় এক জন বলিল, "চুপ্ চুপ্।"

নৌকা একখানা বড় নৌকার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। বোধ করি, কোন বিলাসী, চরিত্রহীন ধনী সেই নৌকায় দশহরার জনসমাগম দেখিতে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন; এখন সেখান হইতে ফিরিতেছেন। সেই নৌকা হইতে নারীকণ্ঠোদ্ভূত তীক্ষ্ণ মধুর গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া, সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দময় সুস্বর-রাজ্য সৃষ্ট করিতেছিল। শারঙ্গ রমণীর কণ্ঠস্বরে আপনার সুর মিলা-

ইতেছিল, তবলা মধুর বলিতেছিল, নারী-কণ্ঠে গীত উঠিতেছিল ;—

"তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে, কেন বল জ্বালাতে এলে?
ছি ছি! ভৃঙ্গ ফিরে যাওহে বাসি ফুলে কি মধু মেলে?
গত নিশিতে কার প্রেমেতে
কোন্ ফুলেতে মজেছিলে?
এখন সখ্যভাব মনে রাখিতে
প্রভাতে দেখা দিতে এলে!
তাই বলি হে রসময়! হয়ে গেছে অসময়,
ক্ষুধার সময় বয়ে গেলে ভাল লাগে কি সুধা দিলে?"

এ নৌকা হইতে অতি কর্কশ কণ্ঠে এক জন যুবক গাহিল,—

"নাম্‌গো শ্যামা হৃদি হ'তে নাচিস্‌নে আর ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, মা,—যোগাসনে মহাযোগী॥"

অন্য যুবকগণ বহু কষ্টে তাহাকে চুপ করাইল। কিন্তু সে বিচিত্র গান বোধ হয় অদূরস্থ বড় নৌকার আরোহীরা শুনিয়াছিল। সহসা গায়িকা অর্দ্ধ-সমাপ্ত-গানেই নীরব হইল, এবং সে নৌকায় সকলে হাসিয়া উঠিল। পুরুষ-কণ্ঠের গম্ভীর হাস্য এবং নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ হাস্য স্পষ্ট বুঝা গেল।

তাহার পর আবার শারঙ্গ সুর দিল; আবার গান চলিল ;—

"ভোমরা! কে তোমারে চায়?
তোমার মত কত শত লুটিয়ে পড়ে পায়।
এ কমলে থাক্‌লে মধু,
আস্‌বে কত ভোমরা বঁধু,
কমল-কলি ছেড়ে অলি কোথায় বল যায়?
বঁধু! কে তোমারে চায়?"

এ গায়িকার কণ্ঠস্বর পূর্ব্ব গায়িকার কণ্ঠস্বর অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ও মধুর।

যুবকদিগের মধ্যে এক জন মাঝিকে বলিল, "ওরে, একটু তাড়াতাড়ি বাহিয়া চল্।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই নৌকা বড় নৌকা ছাড়াইয়া দূরে আসিয়া পড়িল। সে সঙ্গীত ক্রমে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিতে লাগিল; শেষে সে স্বর জলঙ্গীর জলকল্লোলে মিশাইয়া গেল। কেবল জলকল্লোল,—কেবল ক্ষেপণী-ক্ষেপণ-শব্দ।

যুবকদিগের মধ্যে এক জন গম্ভীর হইয়া নৌকার একপার্শ্বে বসিয়াছিল; তাহার দৃষ্টিতে বিরক্তি-ভাব। এক জন তাহাকে বলিল, "কি হে অতুল, একেবারে যে পেচকের মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছ?"

যুবক উত্তর করিল, "তোমরা সব এমন বাঁদরামী করিবে জানিলে আমি তোমাদের সঙ্গে আসিতাম না।"

অধঃপতন।

"হইয়াছে কি?"

"কেন, ও নৌকার গান শুনিয়া উতোর গাহিবার কি আবশ্যক ছিল? চরিত্রহীনাদিগের সহিত পরোক্ষভাবে হাস্য-পরিহাস করাও অন্যায়।"

"সে ত আমরা বলিয়াছি, যোগেনের সেটা অন্যায় হইয়াছিল।"

যোগেন মৃদুস্বরে তাহার পার্শ্বস্থিত এক জনকে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, নৌকাটা যেন প্রার্থনা-মন্দির হইয়া উঠিয়াছে! সব তাতেই পবিত্রতা চাহি! এইরূপ পবিত্রতার হাওয়ায় আমার অপবিত্র প্রাণটা কেমন হাঁপাইয়া উঠে। ঐ জন্যই আমি অতুলের সহিত কোথাও যাইতে চাহি না।"

যোগেনের পার্শ্বস্থ যুবক বলিল, "অতুলের কথা কেন ধর? বুড়া হইতে গেল, তথাপি বিবাহটা করিল না। এখন ও ত জানে না—কত ধানে কত চাউল? কলিতে ত ধর্ম্মের তিন পা ভাঙ্গা, এখনও যদি সকলেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, তবে অধর্ম্ম কোথায় যায় বল ত? আমরা কেহ ওকালতী করি, কেহ ব্যবসা করি, আমাদের কি অত ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে চলে? বিবাহ না করিলে অতুলের পবিত্রতা-পাগলামী যাইবে না।"

তাহার পর সে অতুলকে বলিল, "বলি ওহে অতুল,

কবে একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে বল ত?"

"এ দেশে বিবাহ?"

"কেন, এ দেশটা কিসে মন্দ?"

"এ দেশে বিবাহে পাত্রপাত্রীর মতামত নাই;—এ দেশে বাল্যবিবাহ, শিশুবিবাহ প্রচলিত;—এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা পাপ বলিয়া গণ্য;—এ দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার নামে লোক শিহরিয়া উঠে;—এ দেশে বিধবার বিবাহ নাই, পুরুষের আকাশে যত তারকা তত পত্নী থাকাও দোষের নহে! এ দেশের মানুষ কি মানুষ, ইহাদের কি এতটুকু সৎসাহস আছে?"

"কেন এ দেশের মানুষ মানুষ নহে কিসে?"

"মানুষ হইলে তাহারা বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্য বহুদিন পূর্ব্বেই উঠাইয়া দিত। মানুষ হইলে তাহারা স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত করিত—রমণীকে পুরুষের সমান অধিকার দিত। মানুষ হইলে তাহারা বিবাহে পাত্রপাত্রীর মত লইবার প্রথা প্রচলিত করিত। মানুষ হইলে তাহারা বিধবার মর্ম্মভেদী দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না।"

বক্তার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

কথাগুলি শুনিয়া যোগেন্দ্র হাসিয়া পার্শ্বস্থ বন্ধুর গাত্রে পড়িল। আর এ উহার গা টিপিল। অতুলচন্দ্র সে সকল লক্ষ্য করিল না।

অধঃপতন।

এক জন অতুলচন্দ্রকে বলিল, "তবে তুমি এখন কি করিতে চাহ?"

অতুলচন্দ্র বলিল, "আমি সমাজ-সংস্কার চাহি।"

"তাহাতে কি হইবে?"

"তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে।"

আর এক জন বলিল, "আচ্ছা, সবই না হয় হইবে। এখন ভাষায় আজ্ঞা কর—স্পষ্ট করিয়া বল, তুমি একটা বিবাহ করিবে কি না?"

"বাল্যবিবাহ আমি করিব না। যদি কখনও কোন বিধবার দুঃখ মোচন করিতে পারি, যদি তিনি আমাকে ভালবাসেন বুঝিতে পারি, তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব। নচেৎ বিবাহ করিব কি না সন্দেহ।"

যোগেন মৃদুস্বরে পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিল, "বাল্য-বিবাহ ব্যাপারটা কি? অতুলের বয়স যে প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল—এখনও বালক না কি?"

আর এক জন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নৌকা তীরে লাগিল। এক জন মাঝি বলিল, "বাবুরা নামুন, এই ঘাট।"

তখন সকলে স্ব স্ব জুতার অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

যুবকদিগের সহিত দ্রব্যাদি বিশেষ কিছু ছিল না; কেবল গোটা দুই ছোট ব্যাগ—সে দুইটা দুই জন লইল।

তাহার পর স্ব স্ব ছাতি ও ছড়ি সংগ্রহ করিয়া, সকলে তীরে নামিল। মাঝিকে প্রাপ্য ভাড়া বুঝাইয়া দিয়া যুবকদল গৃহাভিমুখগামী হইল।

নিস্তব্ধ গম্ভীর রাত্রি;—আকাশে একাদশীর চন্দ্র কিরণ ছড়াইতেছে, সেই স্নিগ্ধালোকে বহুদূর-বিস্তৃত সিকতাশয্যা নদীকূলে বিস্তৃত শুভ্র বসনের মত দেখাইতেছে। সেই বহু-দূরবিস্তৃত তৃণলতাবর্জ্জিত বালুকা-শয্যার মধ্যে দুই একটা সঙ্গীহারা বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কালো ছায়া সেই আলোকোদ্ভাসিত শুভ্র সৈকতে আবদ্ধ জলের মত দেখাইতেছে। সৈকতোপরি রাজপথ এখন জনসমা-গমবর্জ্জিত। সেই রাজপথ-পার্শ্বে দুই একটা চন্দ্রালোক-বিধৌত অট্টালিকা দেখা যাইতেছে।

ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া মাঝিরা আপনাদের গৃহে চলিয়া গেল। জলঙ্গীর জলরাশি সেই তীরবদ্ধ নৌকাখানি নাচা-ইয়া খেলা করিতে লাগিল।

বালুময় তীর অতিক্রম করিয়া, যুবকদল আসিয়া রাস্তায় উঠিল। পথি-পার্শ্বে ভস্মস্তূপের উপর একটা কুক্কুর শয়ন করিয়াছিল। তিন চারিটা ছড়ির খোঁচা খাইয়া সেই সারমেয় 'কেঁউ কেঁউ' করিতে করিতে অবনতলাঙ্গুলে পলাইয়া গেল। যুবকদল হাসিয়া উঠিল; সেই নিস্তব্ধ পথে তাহা-দের উচ্চহাস্য কোন ভৌতিক হাস্যবৎ প্রতীয়মান হইল।

অধঃপতন।

কেবল অতুলচন্দ্র বলিল, "ও জীবটাকে কষ্ট দিয়া কি হইল?"

কেহ কোন কথা কহিল না।

যুবকগণ দ্রুতপদে গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিল—পথে আর কেহ বিশেষ কোনও কথা কহিল না।

প্রথম খণ্ড

মেঘ ও রৌদ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর কনে।

উপক্রমণিকায় বর্ণিত ঘটনার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সংসারে নিত্য বহু ঘটনা ঘটিতেছে; এ দুই বৎসরেও বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। সেই নৌকাযাত্রী যুবক-দিগের জীবনেও ইতিমধ্যে নানা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—কর্ম্মোপলক্ষে তাহারা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আজ শরতের সন্ধ্যায়, কলিকাতার একটা গলিতে অতুলচন্দ্রের পিতৃব্যগৃহে, একটা কক্ষে বসিয়া দুই জন যুবক—সদ্যঃপরিণীত অতুলচন্দ্র এবং যোগেন্দ্রনাথ। কুড়ি দিন মাত্র অতুলের বিবাহ হইয়াছে। এ বিবাহ বিধবা-বিবাহ নহে, কুমারী-বিবাহ। সমাজের উন্নতি বা বিধবার দুঃখমোচন, এ বিবাহে অতুল এতদুভয়ের কিছুই করিতে পারে নাই। তবে বিবাহটা নিজের দেখিয়া করা বটে। এ বিবাহের একটু ইতিহাস আছে।

কৃষ্ণনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের এক বৎসর পরে অতুল-চন্দ্রের একমাত্র ভ্রাতার মৃত্যু হয়। শোকটা অতুলের মা'র বড়ই লাগিয়াছিল। তাঁহাকে একটু সুস্থ করিবার আশায় অতুল তাঁহাকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। কোন তীর্থে আর এক জন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হয়৭ তিনি সপরিবারে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত তাঁহার একটি কন্যা ছিল। মেয়েটির একটু বয়স হইয়াছিল; দেখিতে শুনিতে খুব ভাল না হইলেও মন্দ নহে। মোটের উপর অবিবাহিত অতুলচন্দ্রের চক্ষে মেয়েটিকে ভাল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কন্যার পিতা-মাতার তখন কন্যাদায়—মেয়ে আর ঘরে রাখা চলে না। কন্যার মাতা অতুলের মাতার নিকট অতুলের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুলশীল মিলিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই মাতা অতুলকে বিবাহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছিলেন। জননীর অশ্রুতে অতুলের মন নরম হইয়াছিল; তাহার উপর তাহার চক্ষে সুধা-ময়ীকে মন্দ লাগে নাই। কাজেই অতুলচন্দ্র সহজে চতুর্দ্দশ বৎসরের পদতলে এত সমাজ-সংস্কার-বাসনা, এত উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা, সকলই বিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইল।

তীর্থ-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া কন্যার পিতা অতুলের পিতৃব্যের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; বিবাহ স্থির হইয়া গেল। তাহার পর একদিন সন্ধ্যাকালে পিতৃব্যগৃহ হইতে টোপরপরা অতুলচন্দ্র বাহির হইল, এবং তাহার পরদিবস একটি নোলকপরা বধূ লইয়া ফিরিয়া আসিল। নববধূ লইয়া হাসিমুখে অতুলচন্দ্র গৃহে ফিরিল, যেন বহু কষ্টে রাজপুত্রীকে লইয়া আলাদিন গৃহে প্রবেশ করিল!

*   *   *   *   *

যোগেন বলিল, "এখন কি দেখিতেছ? বিবাহিত জীবনটা কেমন বোধ হইতেছে?"

অতুল উত্তর দিল, "খুব ভালই বোধ হইতেছে। এখন ভাবি—কিছু দিন পূর্ব্বে কেন বিবাহ করি নাই!"

"বটে! বটে!"

অতুলচন্দ্র উত্তর দিল না। যোগেন আবার বলিল, "স্ত্রীকে কেমন লাগিতেছে? ইতিমধ্যে শ্বশুরবাড়ী যাইবে না কি?"

"হাঁ, তিন চা'র দিনের মধ্যে একবার যাইব। এই পূজার মধ্যে।"

"বিবাহ হইতে না হইতেই এত টান! ছেলেমানুষ স্ত্রী—তাহাতেই এত?"

"কেন? স্ত্রী ত স্ত্রী বটে—ছেলেমানুষ আর বুড়ামানুষ কি?"

"এখন ঐরূপই বোধ হইবে। এখন নূতন প্রেম, পিয়ানোর বাজনা; তাহার পর ছেলের অসুখ, মেয়ের বিবাহ, এ সব ভাবনা আসুক; তখন কাণের কাছে জয়ঢাক বাজিবে। আর জান ত,—

'নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।'

তবে কথাটা এই, 'যার অদৃষ্টে যেম্‌নি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।' বুঝিলে ভায়া?"

"তোমার সহিত কথায় ত আর কেহ পারিবে না।"

"না হে, আমরা কি না ভুক্তভোগী, পুরাতন পাপী—আমরা সব জানি। পুরাতন মাঝি জানে, নদীতে কোথায় চড়া, কোথায় ঘূর্ণাবর্ত্ত।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"তাহার পর বল দেখি, ডাকঘরের আয় বাড়াইতেছ কি না?"

"কি?"

"অর্থাৎ কি না, সবেগে চিঠি চলিতেছে কি না?"

অতুলচন্দ্র যেন কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িল; বলিল, "তা—তা—হাঁ। একখানা পত্র লিখিয়াছি। কেন, পত্র লেখা কি উচিত নহে?"

"কে বলিল? আমরাও প্রথম প্রথম কত পত্র লিখিতাম; এখন ছাই কথা খুঁজিয়া পাই না। তখন লিখিতে বসিলে কলম আর থামিতে চাহিত না। কয় পৃষ্ঠা পত্র লিখিয়াছ—আট না ষোল?"

"না—না। অত বড় নহে।"

"তবুও ভাল।"

নানা কথার পর যোগেন বিদায় লইয়া উঠিল।

গৃহের পথে যোগেন অতুলের কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। তাহার প্রফুল্লমুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, কি পরিবর্ত্তন! এই সেই অতুল! এত সমাজসংস্কার-বাসনা, এত উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা—সে সকল এখন পত্নীপদে অঞ্জলিদত্ত! আমি বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী নহি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হইল, নূতন প্রেমের উন্মাদকর ভাব দিনকতক পূর্ণমাত্রায় পান করা গেল, তাহার পরে—বাস্! সংসারী হইয়া সংসারের কার্য্যে ষোল আনা মনোযোগ দেওয়া গেল। জীবন ত আর স্বপ্ন নহে। তাহা না করিয়া এতকাল এক একটা কল্পনা লইয়া কাল কাটাইয়া শেষে একটা বিবাহ করা। হৃদয়খানা মরু হইয়া থাকে, জল পড়িবামাত্র শুষিয়া লয়; কিন্তু সে ক্ষণিক তৃপ্তিমাত্র—সে জলে জ্বালা জুড়ায় না—অতটুকু জলে মরু শীতল হয় না। এখন আমরা পত্নীর আদর্শ, কল্পনা করি প্রতীচ্য—পাই, পূরা প্রাচ্য পত্নী। যত দিন যায়, প্রতীচ্য আদর্শ তত হাড়ে হাড়ে বসে। ভায়ার ত দেখিতেছি নেশা খুব জমিয়াছে—এখন খোঁয়ারী না আসিলেই মঙ্গল।

সেই দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ান অতুলচন্দ্রের হৃদয়-

পটে একটি বালিকার ছবি ফুটিয়া উঠিল—বর্ণ প্রায় গৌরের কাছাকাছি, গঠন মন্দ নহে। অতুলের নিকট সে ছবিখানি বড় ভাল লাগিতেছিল।

অতুল ভাবিতে লাগিল,—তাহার স্তব্ধগৃহে একাকিনী বালিকা কি ভাবিতেছে? তাহার কথা? সে তাহাকে যেমন ভালবাসে, বালিকা কি তাহাকে তেমনই ভালবাসে? হয় ত না। মন আপনাকে আপনি প্রবোধ দিল—যদি এখন না বাসে, পরে বাসিবে; এখন সে বালিকামাত্র। তাহার পর অতুল আবার ভাবিতে লাগিল,—আমি যে কয় দিন পরে শ্বশুরালয়ে যাইব, সে সংবাদ সে অবশ্যই পাইয়াছে—পাইয়া তাহার অবশ্য আনন্দ হইয়াছে! তাহাকে দেখিবার আশায় আমার যেমন আনন্দ হইতেছে, আমাকে দেখিবার আশায় তাহার কি তেমন আনন্দ হইতেছে? কেন হইবে না?

অতুলচন্দ্র পত্নীর সহিত সেই দিন-দুই সাক্ষাতের কথা ভাবিতে লাগিল; বালিকার সকল কথাতেই সে সরলতা ও ভালবাসা দেখিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে সকল কথা-রই বহু অর্থ করা যায়; অতুলচন্দ্র পত্নীর সকল কথার মনের মত অর্থ করিয়া ভাবিতে লাগিল,—সেই বালিকা-হৃদয় কি ভালবাসায় পূর্ণ! সেই অমৃতভাণ্ড আমার! আমি আজ কি সুখী! বিবাহিত জীবনে যদি এত 'সুখ,

তবে ইতিপূর্ব্বে কেন বিবাহ করি নাই? কিন্তু পূর্ব্বে বিবাহ করিলে ত সুধাময়ীকে পাইতাম না!

অতুলচন্দ্র এমনই কত কি ভাবিতে লাগিল।

নববিবাহিত, নবজীবনে প্রবেশ করিয়া, প্রথমেই কত স্বপ্ন, কত আশার সৃষ্টি করে। সে সকল স্বপ্ন, সে সকল আশা কত সুখের! সে সকল দিবাস্বপ্ন কি মধুময়, কি সুখময়! মানবহৃদয় স্বেচ্ছায় স্বর্গ বা নরকের সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু স্বর্গসৃষ্টি করিতে পারিলে কি কেহ ইচ্ছা করিয়া নরকসৃষ্টি করিতে চাহে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্য কক্ষে।

যে নিশীথে বিনিদ্র অতুলচন্দ্র নানা সুখ-স্বপ্নের সৃষ্টি করিতেছিল, সেই নিশীথে তাহার পার্শ্বস্থ কক্ষে আর এক জন যুবক বিনিদ্র ছিল; সে অতুলচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেশ।

দীপালোকিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া ভবেশ কি ভাবিতেছিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া, সে একটা বাক্স খুলিল, খুলিয়া বাক্স হইতে একতাড়া পত্র বাহির করিল। একটা ফিতা দিয়া পত্রগুলা একত্র বাঁধা। পত্রগুলার লেখা কাঁচা—বালিকার লেখা বলিয়া অনুমান হয়। এক এক করিয়া পত্রগুলা খুলিয়া ভবেশ পড়িতে লাগিল,—তাহার উজ্জ্বল নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, শেষে দুই ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া একথানা পত্রের উপর পড়িল। করতলের পশ্চাতে অশ্রু মুছিয়া, সে আবার পত্রগুলা পড়িতে লাগিল। একে একে সে সব পত্রগুলি পড়িল। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি দারুণ বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া গেল।

পত্রগুলা বাঁধিয়া বাক্সে তুলিয়া, ভবেশ বাক্স বন্ধ করিল; তাহার পর আসিয়া শ্রান্তভাবে শয্যায় পড়িল। শয্যায় শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এ কি হইল?

সেই বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতি আবার কেন জাগিল, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি আবার কেন জ্বলিল? আবার এ কি হইল? সেই অতীতের কথা, সেই অতীতের স্মৃতি! আজ যে সে সকল আবার নূতন হইয়া উঠিতেছে! এখন কি করি? এ হৃদয় চঞ্চল।

ভাবিতে ভাবিতে যুবক উঠিয়া বাতায়নের কাছে গেল। কক্ষমধ্যে সমীরণ নাতিশীতোষ্ণ, তথাপি চিন্তা-তাড়িত যুবকের কপালে মুক্তার মত স্বেদবিন্দু লক্ষিত হইতেছিল। যুবক বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, বাতায়নের কাছেই বসিল। সম্মুখে পথ; এখন সে পথে পথিকের গতায়াত বড় নাই। পথের অপরপার্শ্বস্থ একটা গৃহের কক্ষ-বাতায়নে আলোক দৃষ্ট হইতেছে; সে ঘরে বসিয়া একটি ছাত্র রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছে। অদূরবর্ত্তী বৃহৎ রাজপথে মধ্যে মধ্যে দুই একখানা শকটের গমনশব্দ শ্রুত হইতেছে।

বাতায়ন-সম্মুখে বসিয়া যুবক কত কি ভাবিতে লাগিল। সেই নৈশসমীরণ তাহার মুখে, চক্ষে আপনার স্নেহ-কর-স্পর্শ দান করিতে লাগিল। যুবকের দৃষ্টিপথ হইতে যেন অতীতের যবনিকা অপসৃত হইয়া গেল। তাহার মানস-পটে একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নসম্মুখে

অধঃপতন।

একটি বালিকা-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। সে বুঝি একটা বাল্য-প্রেম-কাহিনী!

প্রথম যৌবনে কত জন কত বালিকার মুখে এক অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিতে পায়,—তাহাদের নয়নে অসীম সুখস্বপ্নাবেশ দেখিতে পায়। সে প্রেমের অঙ্কুর, সে প্রেম তখন লালসাবিহীন—পবিত্র। ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মত সে স্রোত হৃদয়ের এক পার্শ্ব বিধৌত করিয়া বহিয়া যায়,—সে স্রোত অমল; তাহার স্পর্শে হৃদয় উর্ব্বর হইয়া উঠে—হৃদয় কোমল হয়। সে লালসাবিহীন প্রেম তখন সর্ব্বগ্রাসী, কূলধ্বংসী আকার ধারণ করে না। যদি সে প্রেম লালসা-সমল হইবার অবকাশ পায়, তবেই তাহা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠে। তথাপি বাল্যপ্রেমের স্মৃতি সহজে অপনীত হইবার নহে। সংসার-সংঘাতে বৃত্তি সকল বিকল হইবার পূর্ব্বে, যখন হৃদয় নির্ম্মল থাকে, প্রেম-প্রবৃত্তি নবীন থাকে, তখনকার প্রেম-স্মৃতি সহজে হৃদয় হইতে অপনীত হয় না। বিমল দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন পূর্ণ, পরিষ্কার, স্পষ্ট দেখায়, সমল দর্পণে সেরূপ দেখায় না। নবীন হৃদয়ের প্রেম সহজে ভুলিবার নহে। হৃদয় অনুসন্ধান কর, দেখিবে, অতীত জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন নানা স্মৃতির মধ্যে একটি স্মৃতি বড় স্পষ্ট; দেখিবে, সে অন্ধকার হৃদয়-আকাশে একটি তারকা বড় উজ্জ্বল। সে

হয় ত আজ কত দিনের কথা! সে হয় ত স্বপ্নরাজ্যের স্মৃতি! কিন্তু সেই কবে কোন বালিকার নয়নে কি মোহময় ভাব দেখিয়াছিলে! তাহার মুখে কি স্বর্গীয় সুষমা দেখিয়াছিলে! সে কথা আজও ভুলিতে পার নাই। সেই কবে একদিন আত্মহারা হইয়া তাহার মুখ-পানে চাহিয়াছিলে, আবার নয়নে নয়ন মিলিলে কেন আঁখি নত করিয়াছিলে—সে কথা আজও ভুলিতে পার নাই।

প্রথম যৌবনের অমল প্রেম সহজে ভুলিতে পারা যায় না। যে প্রেম হৃদয়ে চিহ্ন রাখিয়া যায়, সে প্রেম-স্মৃতি কি ভুলিবার? ভুলিবার হইলে ভবেশ এত দিনে ভুলিতে পারিত—ভুলিবার হইলে সে আজ হৃদয়ে এ যাতনা সহ্য করিত না।

সেই নিশীথে ভবেশ একাকী কত কি ভাবিতে লাগিল—সেই প্রেম, সেই অতীত; সেই প্রেম, আর সেই—

ভবেশের কপাল বহিয়া স্বেদ ঝরিতে লাগিল। বহুক্ষণ বসিয়া ভবেশ চিন্তা করিল। অদূরে একটা ঘড়ীতে তিনটা বাজিল, তখন বাতায়ন বদ্ধ করিয়া, সে শয়ন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দম্পতী।

শরতের অপরাহ্ন—মেঘমুক্ত পশ্চিম গগনে তপন হেলিয়া পড়িয়াছে। ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে একটা ছোট সহরের ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ স্থির হইল। লোকের উঠা নামা, ডাকাডাকির গোল উঠিল। কিছু বোঝা নামাইয়া, আবার নূতন বোঝাই লইয়া, হুইস্‌ল্‌ দিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। ষ্টেশন আবার নিস্তব্ধ হইল।

যাহারা নামিল, তাহাদের মধ্যে এক জন আমাদিগের পরিচিত—অতুলচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যাইতেছে। সমস্ত পথ অতুলচন্দ্র কত সুখের কল্পনা করিতে করিতেই আসিয়াছে। সুধাময়ীর প্রভা তাহার হৃদয় যেন আলোকময় করিয়া তুলিয়াছিল। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, অতুলচন্দ্র শ্বশুরালয়াভিমুখে চলিল।

অল্পক্ষণমধ্যেই গাড়ীখানা গন্তব্য স্থানে আসিয়া স্থির হইল। তখন অতুলচন্দ্র সেই অস্থিচর্ম্মসার-বাহনযুগল-বাহিত, বিচিত্রশব্দকারী, ধূলিধূসর যান হইতে অবতরণ করিল। বাড়ীটার সম্মুখে খানিকটা জমী; বোধ হয়, কখনও তাহাতে পুষ্পোদ্যান ছিল, বা পুষ্পোদ্যানরচনার চেষ্টা হইয়াছিল। এখন এক পার্শ্বে কেবল আছে গোটাদুই টগর আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ; আর এক পার্শ্বে বেড়ার কাছে

একটা শীর্ণ জাতিফুলের গাছে গোটাকতক পত্রমাত্র অবশিষ্ট আছে,—আর পত্র প্রতিবেশীরা ক্ষত-তৈলের জন্য আবশ্যকমত লইয়া গিয়াছে। বাটীর সম্মুখভাগ একতল, পশ্চাৎভাগ দ্বিতল। সম্মুখেই বৈঠকখানা; সেই ঘরে উঠিয়া অতুলচন্দ্র সসম্ভ্রমে শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

ব্যস্তভাবে হুঁকাটা রাখিয়া, শ্বশুর জামাতাকে বসিতে বলিলেন। গরদের কোটগায় অতুলচন্দ্র বসিল। তাহার পর, শ্বশুর সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জামাইবাবুর আগমনবার্ত্তা পাইয়া অতুলচন্দ্রের শ্যালকযুগল অন্তঃপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কনিষ্ঠ শ্যালকটির বয়স চার বৎসর হইবে, কাপড়ের উপর তাহার কেমন একটা বিরাগ ছিল। আজ জামাইবাবুর শুভাগমনে তাহার মাতা তাহাকে একখানা কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু বহির্বাটীতে আসিবার পূর্ব্বেই কোমরের সহিত বিবাদ করিয়া কাপড় ভূমিতলগামী হইতেছিল। বালক বৈঠকখানায় আসিলে কাপড় আর বিলম্ব করিল না,—ভূমিতল স্পর্শ করিল। পায়ে কাপড় বাধিয়া বালক পড়িয়া গেল। অতুলচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া তুলিল। বালক গম্ভীর হইয়া বসিল; কাঁদিল না। অতুলচন্দ্র ভাবিল, কি শান্ত!

তাহার পর, জলখাবার খাইবার জন্য অন্তঃপুর হইতে

চাকর ডাকিতে আসিলে, অতুলচন্দ্র অন্তঃপুরে গেল। তাহার হৃদয় যেন একটু বেগে আঘাত করিতে লাগিল। অতুলচন্দ্র আহার করিতে বসিল; অবগুণ্ঠনবতী শাশুড়ী-ঠাকুরাণী "এটা খাও, ওটা খাও, আর একটু খাও" বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুবোধ বালকের মত ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া, অতুলচন্দ্র খাবারের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিল; তবুও শাশুড়ী বলিলেন, "কিছু খাইলে না।" অতুলচন্দ্র ভাবিল, কি যত্ন!

বাহিরে আসিবার সময় অতুলচন্দ্র দেখিল, একটা ভেজান দ্বারের পার্শ্ব হইতে কে সরিয়া গেল। সে বাটীর কোন দাসী বা কোন প্রতিবেশিনী হওয়া কিছু-মাত্র অসম্ভব না হইলেও অতুলচন্দ্র ভাবিল, সে নিশ্চয়ই সুধাময়ী।—বালিকার পিপাসিত নয়ন তাহাকেই দেখি-য়াছে! সেই ক্ষুদ্র বালিকার বক্ষে কি অসীম ভালবাসা!

অতুলচন্দ্র আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। তখন সূর্য্য চক্রবাল-নিম্নে ডুবিয়াছে—তবে রবির ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করজালে তখনও অম্বর আলোকিত। কপালে একমাত্র শুকতারার টিপ পরিয়া, লজ্জা-নম্রা নববধূর মত, সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আসিতেছে। অদূরে কোন গৃহে পূজার সময় নহবৎ বসিয়াছে; সেই সুমিষ্ট নহবৎ-ধ্বনি সন্ধ্যায় যেন এক মাধুরী সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে।

অতুলচন্দ্রের বোধ হইতে লাগিল, আজ যেন আর রাত্রি আইসে না! ক্রমে ক্রমে একটু অন্ধকার হইল; পূজা-গৃহে আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর বাজিয়া উঠিল। পবিত্র ধূনার ধূম পবনে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

* * * *

সে রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অতুলচন্দ্র দেখিল, স্থির, নিশ্চল হইয়া সুধাময়ী শয্যায় শুইয়া আছে। ধীরে, কোমল-স্বরে অতুলচন্দ্র ডাকিল,—"সুধা!" সুধাময়ী নীরব। অতুলচন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার শয্যাবিলুণ্ঠিত কর আপন করে তুলিল—সুধাময়ী নিশ্চল। অতুলচন্দ্র ভাবিল, বুঝি-সুধাময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; সে ধীরে ধীরে সুধাময়ীর হাতখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এবার সুধাময়ীর পালা। সুধাময়ী ভাবিল, অতুলচন্দ্র হয় ত ভাবিয়াছে, সে ঘুমাইয়াছে; সে তাহার ছলনা বুঝিতে পারে নাই। এরূপ ছলনায় অনভ্যস্ত যুবক বুঝে নাই যে, স্বামিসন্দর্শনাশায় রমণীর পক্ষে নিদ্রা যাওয়া অপেক্ষা জাগিয়া থাকাই স্বাভাবিক। সুধাময়ী একটু নড়িল,—অতুলচন্দ্র ভাবিল, লজ্জায় সুধাময়ী কথা কহে নাই—কি কোমল লজ্জা!

অতুলচন্দ্র আবার ডাকিল, "সুধা!"

এবার সুধাময়ী স্বামীর দিকে ফিরিল।

অতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

অধঃপতন।

অতি মৃদুস্বরে সুধাময়ী উত্তর করিল, "তত ভাল নাই।"

"কেন? কোন অসুখ করিয়াছে?"

সুধাময়ী বলিল, "তুমি এত দিন একবার আসিলে না কেন?"

সরল অতুলচন্দ্রের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে ভাবিল, বুঝি তাহার অদর্শনই সুধাময়ীর নিকট অসুখ। সুধাংশুদর্শনে সমুদ্রের হৃদয় যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সুধাময়ীর কথায় অতুলচন্দ্রের হৃদয় তেমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সরলহৃদয় অতুলচন্দ্র মুগ্ধ—মোহিত হইল। জগতে বুঝি সরলতাতেই সুখ।

তাহার পর সুধাময়ী অতুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন আছ?" অতুলচন্দ্র একটু বিপদে পড়িল; তাহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল, পীড়ার লক্ষণ কিছুমাত্র ছিল না; কিন্তু তাহার বিরহে সুধাময়ী ভাল ছিল না; বালিকার যতটুকু ভালবাসা, তাহার কি ততটুকুও নাই? একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "মন্দ নহে।"

অতুলচন্দ্র একটু সরিয়া গেল; তাহার পর আরও একটু সরিয়া গেল, তাহার পর সুধাময়ীর মুখচুম্বন করিল। অতুলচন্দ্রের হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার পক্ষে ইহা নিতান্তই নূতন। যাহারা অপবিত্র

অধরে অপবিত্র চুম্বন দান করিয়া প্রথম চুম্বন শিক্ষা করে, অতুলচন্দ্র তাহাদের অন্তর্গত নহে। পত্নীর অধরে চুম্বন দান করিতে অতুলচন্দ্র শিহরিয়া উঠিল।

তাহার পর অতুলচন্দ্র আপনার বক্ষের উপর পত্নীর মস্তক স্থাপন করিল। প্রেমের সেই নন্দনে সুধাময়ী কি মনে করিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে তাহারও হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে প্রেমপুলকে, কি পূর্ব্বকথা-স্মরণে, তাহা বলিতে পারিলাম না।

তাহার পর দুই জনেই নীরব হইয়া রহিল। কিছু ক্ষণ পরে অতুলচন্দ্র পত্নীকে বলিল, "অনেক রাত্রি হইল,—ঘুমাও।"

তখন সুধাময়ী উঠিল, অতুলচন্দ্রও উঠিল। সুধাময়ী উঠিয়া মৃণালকোমল বাহুপাশে স্বামীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। পত্নীর প্রথম চুম্বনে অতুলচন্দ্রের শরীরের প্রতি শিরা উপশিরা যেন একটা অসহ্য পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল; তাহার সর্ব্বশরীরে যেন বিদ্যুৎসঞ্চার হইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত আনন্দমদিরা তাহাকে বিভোর করিয়া তুলিল। অতুলচন্দ্র বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া, পত্নীকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিল, এবং আবেগময় চুম্বনের পর চুম্বনে তাহার আনন প্লাবিত করিয়া দিল। সুধাময়ী সহজেই স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

অধঃপতন।

যাহা সহজে জেয়, তাহা জয় করিতে হৃদয়ে একটা প্রবল বাসনা ও সেই বাসনার উত্তেজনা হয় না; কাজেই তাহা জয় করিতে পারিলে সাফল্যজনিত একটা অসীম তৃপ্তি এবং আনন্দও অনুভূত হয় না। যাহা দুর্ল্লভ, যাহা দুর্জ্জেয়, তাহাই লাভ করিতে,—তাহাই জয় করিতে হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মে, এবং তাহা পাইলে একটা অসীম আনন্দও অনুভূত হয়। আবার যাহা যত দুঃখলব্ধ, তাহা তত অধিক প্রিয় হয়। অতুলচন্দ্রের হৃদয় জয় করিতে সুধাময়ীকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল না, সে তাহা বিনা আয়াসেই পাইল। সে হৃদয় তাহার অধিক প্রিয় হইবে কি?

সে হৃদয় সুধাময়ীর অধিক প্রিয় হইবে কি না জানি না, কিন্তু সে হৃদয় দিয়া অতুলচন্দ্র বিশেষ তৃপ্তি,—তৃপ্তি কেন, আনন্দই অনুভব করিল। সুধাময়ীকে ভালবাসিয়া অতুলচন্দ্র মনে করিল, জগতে ইহাই স্বর্গসুখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংসারে।

পল্লীগ্রামে একটা পুরাতন অট্টালিকা। বাহিরের একটা ঘরে কয় জন লোক বসিয়া আছে; তাহাদিগের মধ্যে অতুলচন্দ্র এক জন। তাহার পা ধরিয়া এক জন কৃষক কাঁদিতেছে। ঘরটায় দুইখানা তক্তাপোষ পাতা, তাহার উপর একটা মসীময় ও তৈলচিহ্নপূর্ণ বিছানা; সেই বিছানার উপর দুইটা বাক্স সম্মুখে লইয়া দুই জন লোক বসিয়া আছে, আর বিছানার এক পার্শ্বে কয়টা দপ্তর। এটা জমীদারী কাছারী।

অতুলচন্দ্র এখানে কেন? সংসারের গতিই এইরূপ; আজ যে এখানে, কাল্ সে ওখানে; আজ যে এক স্থানে, কাল্ সে অন্যত্র। বিবাহের পর কিছু দিন স্বপ্ন-রাজ্যে কাটিয়া গেল—শ্বশুরালয় আর নিজাবাস, নিজাবাস আর শ্বশুরালয় করিয়া, কয় মাস কাটিল। সময় কাটাইতে সুধাময়ীর স্মৃতির মত আর কিছুই ছিল না। তাহার পর অতুলচন্দ্র দেখিল, জীবন স্বপ্ন নহে। স্ত্রীর জন্য জগতে যাহা কিছু সুন্দর সংগ্রহ করিতে হইলে, অর্থের আবশ্যক হয়। অর্থ জিনিসটার উপর অতুলচন্দ্রের বড় ঘৃণা ছিল; কিন্তু এখন সে ঘৃণা গিয়া যেন একটু কেমন আকাঙ্ক্ষা, কেমন একটু মমতা দাঁড়াইল। অতুল-

চন্দ্রের কিছু পৈতৃক জমীজমা ছিল; এতদিন সে, সে সকলের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই, এখন সেই সকলই অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করিল। অশান্ত সন্তান যেমন বহুদিন উচ্ছৃঙ্খল অবহেলার পর পরিশেষে পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া আইসে, অতুলচন্দ্র তেমনই পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল। জমীদার-সম্প্র-দায়ের উপর তাহার বড় রাগ ছিল; কেন না, জমীদারগণ প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, অসৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে জমীদার না থাকিলে প্রজার উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা, তাহা সে বুঝে নাই। জমীদারদিগের শত সদ্‌গুণ তাহার চক্ষে পড়ে নাই। কোথায় এক আধ জন জমীদারের অত্যাচারের কথা শুনিয়া সে একে-বারে জমীদার-সম্প্রদায়ের উপরেই চটা ছিল। কিন্তু দেশে আসিয়া সে দেখিল যে, প্রজার প্রণাম মন্দ লাগে না; প্রজাপ্রদত্ত সম্মান জিনিসটা উপাদেয়। এই গেল প্রথম অবস্থা। তাহার পর অতুলচন্দ্র দেখিল, প্রজাপীড়ন করিলে কিছু উপরি-লাভ হয়; আর অর্থ জিনিসটার বড় আব-শ্যক। সুতরাং সময় সময় অল্পবিস্তর প্রজা-পীড়নও আরব্ধ হইল। তখন অতুলচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, পিতা কেন আরও কিছু সম্পত্তি করিয়া যান নাই!

তাহার পর একটু অগ্রসর হইতে পারিলে এ পথে

অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত সহজ, এবং তাহাতে তখন আনন্দও বেশ। বিশেষ উত্তেজনা ত আছেই, সেই উত্তেজনাতেই তখন বেশ একটু আনন্দ অনুভূত হয়।

বিবাহের পর সংসারী হইয়া অতুলচন্দ্র এক আদর্শ ছাড়িয়া অন্য আদর্শ গ্রহণ করিল। সে অতীত-জীবন, সে সকল অতীতচিন্তা, সব স্বপ্নে পরিণত হইয়া গেল। এই সংসার এমনই বটে!

আজ এক জন প্রজা অতুলচন্দ্রের পা ধরিয়া কাঁদিতেছে। তাহার একটা গরু অতুলচন্দ্রের আর এক জন প্রজার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই অপরাধে অতুলচন্দ্র তাহার দশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছে, তাই সে তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে। তাহার অশ্রুতে অতুলচন্দ্রের হুকুম ফিরিল না; তখন সেই হতভাগা নিরুপায় হইয়া, সেই গরুটি বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে গেল। সে হতভাগার প্রাণের রোদন কেহ বুঝিল না। লাঙ্গলের দুইটি গরুর একটি বিক্রয় করিলে এ বৎসর আর চাষ, হইবে না; তাহা হইলে আহারই জুটিবে না; জমীদারের খাজনা ত পরের কথা। কাজেই তাহাকে অনাহার-ক্লিষ্ট পরিবার লইয়া ভিটা ছাড়িয়া মরিতে অন্যত্র যাইতে হইবে। পৈতৃক ভিটায় তাহার মরিবারও স্থান হইবে না। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে প্রজা ত একেই অপূর্ণা-

হারে দিন যাপন করে, তাহার উপর আবার দেয়াধিক দিতে হইলে তাহার আর জীবনধারণের উপায় থাকে না। এ বিষয়ে অবশ্য প্রজা একেবারে নির্দ্দোষ নহে; সে জমীতে উপযুক্তরূপে সার প্রদান করে না, উপযক্ত জলদানের বন্দোবস্ত করে না, কাজেই একবার বৃষ্টি হইতে বিলম্ব হইলে, একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহার দোষের জন্য দায়ী তাহার দারিদ্র্য। জমীর উন্নতি-সাধন, জমীতে জল দিবার বন্দোবস্ত, উৎকৃষ্ট পশু ক্রয় করা সবই ব্যয়সাধ্য—দরিদ্রের পক্ষে অসাধ্য।

কাছারী ভাঙ্গিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় অতুলচন্দ্র উঠিল; উঠিয়া স্থূলদেহে তৈলমর্দ্দনের উদ্যোগ করিল। এক জন ভৃত্য এক বাটী তৈল আনিয়া বাবুর দেহে মাখাইতে লাগিল। তাহার পর তৈলমর্দ্দন শেষ হইলে, ধীর-মন্থর-গমনে অতুলচন্দ্র নদীতে স্নান করিতে গেল।

সেই দিন স্নানান্তে গৃহে ফিরিবার সময় পথে অতুল-চন্দ্র একবার মনে করিল, এ কি করিতেছি? সে আদর্শ, সে জীবন কোথায় গেল? আমার এ জীবনের সূত্রপাত কবে হইতে?—বিবাহের পর হইতে! তবে ইহার কারণ কে? সুধাময়ী! সে কি কথা! অতুলচন্দ্রের হৃদয় কেমন করিয়া উঠিল, সে শিহরিয়া উঠিল!

কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করিলে তাহার জন্য মনকে

প্রবোধ দিবার অসুবিধা হয় না। অত্যাচারীর ছুতা আবশ্যক; সে ত আছেই। তদ্ভিন্ন ক্ষেত্রভেদে ছুতারও অভাব হয় না। নহিলে অত্যাচারী অত্যাচার করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিত না,—নহিলে পাপী পাপ করিয়া যাতনাপূর্ণ-হৃদয়ে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে জগতে পাপ থাকিত না।

অতুলচন্দ্র ক্রমে অদৃষ্টবাদী হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, "ইহাই আমার নিয়তি; আমি যেখানেই যাই, নিয়তি কি অতিক্রম করিতে পারিব? এই সংসারই আমার কর্ম্মক্ষেত্র, ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে এখানে আনিয়াছেন। আমি কে, আমি কি? আমি কি করিতে পারি? তিনি আমার হৃদয়স্থিত, তিনি আমাকে যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি। আমি ত কলে চালিত পুত্তলিকামাত্র, আমি কি স্বেচ্ছায় কিছু করিতে পারি? তিনি যাহা করান, আমি তাহাই করি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অবলার বল।

সেই দিন আহারান্তে দিবানিদ্রার জন্য অন্য দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়েরও পূর্ব্বে অন্তঃপুরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অতুলচন্দ্র দেখিল, সুধাময়ী কি একখানা পত্র লিখিতেছে। জুতা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া যাইয়া সে সুধাময়ীর পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইল; দেখিল, পাঠ—"প্রিয়তম।" অতুলচন্দ্র চমকিয়া উঠিল। সেই সময় সুধাময়ী মুখ তুলিল;—দেখিল, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অতুলচন্দ্র! তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার পরেই সে পত্রখানা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিল। বাতাসে কাগজের টুক্‌রাগুলা উড়িয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। সুধাময়ী উঠিয়া দাঁড়াইল।

অত্যন্ত স্থির কঠোরস্বরে অতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে পত্র লিখিতেছিলে?"

তাহার কণ্ঠস্বর ঘৃণা, যাতনা, তীব্রতা এবং কঠোরতায় পূর্ণ।

মুখ তুলিয়া সুধাময়ী দেখিল, স্বামীর নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে; সে মলিনবর্ণ মুখও যেন একটু রক্তিম হইয়াছে। জীবনে এই প্রথম অতুলচন্দ্র পত্নীর সহিত এমন কঠোরস্বরে কথা কহিল। যে সন্দেহে, যে অবি-

অধঃপতন।

শ্বাসে সে ভীষণ যাতনা অনুভব করিতেছিল, সুধাময়ী কি তাহা বুঝিতে পারে নাই? সে নীরব হইয়া রহিল।

অতুলচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে পত্র লিখিতেছিলে?"

সুধাময়ী কিছু বলিল না, কেবল বাহুপাশে অতুলচন্দ্রের গলদেশ বেষ্টন করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সেই বাক্যোচ্চারণোন্মুখ ওষ্ঠাধরের বাক্যস্রোত রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিল।

অতুলচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে পত্র লিখিতেছিলে?"

এবার স্বর অপেক্ষাকৃত কোমল। সুধাময়ী বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে; সহজেই তাহার চক্ষে জল আসিল; সে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিল। অতুলচন্দ্র দেখিল, পত্নীর নয়নে জল টল্ টল্ করিল, তাহার পর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িল। অতুলের ক্রোধ সেই অশ্রু-স্রোতে ভাসিয়া গেল; তাহার ইচ্ছা হইল, সেই গণ্ডে চুম্বন করিয়া, সে অশ্রু মুছিয়া দেয়; কিন্তু সে এক-বার আত্ম-সংবরণ করিল।

এবার সুধাময়ী স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমারই উদ্দেশে পত্র লিখিতেছিলাম।"

অধঃপতন।

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া সুধাময়ী কাঁদিতে লাগিল।

অতুলচন্দ্রের রাগের বালির বাঁধ ভাসিয়া গেল। সে বলিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

সুধাময়ী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অতুলচন্দ্র তাহার মুখখানা তুলিয়া চুম্বন করিল। তবুও সুধাময়ীর অশ্রু থামে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুধাময়ী বলিল, "এখন মরণই আমার মঙ্গল। আর ও আদর কেন? আমায় বিদায় দাও, আমি বিষ খাইয়া মরি।"

অতুলচন্দ্র বলিল, "সে কি?"

"যে স্ত্রীকে স্বামী বিশ্বাস করে না, তাহার মরণই মঙ্গল।"

"আমি যদি না বুঝিয়া কিছু বলিয়া থাকি, সে জন্য কি অমন রাগ করিতে আছে? কিন্তু তুমি ও কি পত্র লিখিতেছিলে?"

"এই দেখ তোমার উদ্দেশে কত পত্র লিখিয়াছি।"

সুধাময়ী বাক্স খুলিয়া এক গাদা পত্র লইয়া আসিল। অতুলচন্দ্র কয়খানা পাঠ করিল,—সবগুলাই প্রেমপত্র—তাহাকে লেখাই সম্ভব। অতুলচন্দ্র একটু ভাবিল। সহজে কি কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে যে, পত্নী বিশ্বাসহন্ত্রী, পরানুরক্তা? অতুলচন্দ্র ভাবিল, বুঝি তাহার অনুপস্থিতি-

কালে তাহার প্রেমময়ী পত্নী তাহার উদ্দেশে পত্র লিখিয়া সময় কাটায়। নহিলে সে এতগুলা পত্র লিখিয়া, রাখিয়া দিয়াছে কেন? যদি সে অন্য কাহাকেও পত্র লিখিত, তবে সেগুলা না পাঠাইয়া রাখিয়া দিত না। আর সেরূপ পত্র গোপনে লিখিয়া, গোপনে পাঠাইতে হয়; এত পত্রই বা কেন? অতুলচন্দ্রের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল; তাহার প্রধান কারণ কিন্তু সেই কয় ফোঁটা অশ্রু। অতুলচন্দ্র বুঝিল, তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় সুধাময়ী পত্র ছিঁড়িয়াছে।

সুধাময়ীর মানভঞ্জন করিতেই অতুলচন্দ্রের সে মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল। প্রেমার্দ্রভাবে অতুলচন্দ্র সুধাময়ীকে বলিল, "তোমার প্রেমই আমার জীবন; তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। কেমন করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিব, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? যদি আমি অন্যায় করিয়া তোমায় তিরস্কার করিয়া থাকি—তুমি রাগ করিও না।"

অতুলচন্দ্র তাহার অশ্রু যত মুছায়, সুধাময়ীর অশ্রু ততই অধিক বহে। সে অশ্রু-স্রোতোমুখে অতুলচন্দ্রের সন্দেহ, ক্রোধ কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? স্ত্রীর উপর স্বামীর ক্রোধ প্রায়ই বালির বাঁধমাত্র,—কেবল স্বামীই মনে করে, তাহা পর্ব্বত।

এ দিকে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। তখন বহু কষ্টে সুধা-

ময়ীর অশ্রু-প্রবাহ নিবারিত করিয়া অতুলচন্দ্র বহির্বাটীতে গমন করিল। তখন তাহার মনে আর রাগও নাই, সন্দেহও নাই!

অতুলচন্দ্র চলিয়া গেলে, সুধাময়ীর অধরে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুধাময়ী কিছু ক্ষণ হাসিল; তাহার পর আপনা-আপনি বলিল, "পুরুষ এমনই বোকাই বটে! রমণীর বুদ্ধির সহিত পুরুষের বুদ্ধি কি কখন সমান হইতে পারে? রমণীর কৌশলে পুরুষ চিরদিনই পরাজিত। চিরদিনই মহেশের মস্তকে মন্দাকিনী, শ্যামার চরণ-তলে শিব।"

সুধাময়ী কিছু ক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর সে আবার একখানা পত্র লিখিল। লিখিয়া খামে আঁটিয়া ঠিকানা লিখিয়া, ঝিকে দিয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। যে পত্র সে অতুলচন্দ্রকে দেখিয়া ছিঁড়িয়াছিল, এ কি সেই পত্র?

রমণী অবলা। কিন্তু অবলা রমণীর যে বল আছে, পুরুষের সে বল আছে কি? সেই অবলার বলের নিকট সবল পুরুষের বল পরাজিত। মানব অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে পারে, তথাপি রমণীর প্রভাব দূর করিতে পারে না। কেন না, দুর্ব্বলতাই রমণীর বল, আর সে বলের মত বল জগতে আর নাই। জগতে

কত মানব রমণীর জন্য বুদ্ধি হারাইয়া রমণীর দাস হইয়াছে; কত জন রমণীর জন্য কত ভ্রম করিয়াছে, পাপ করিয়াছে, আত্মহত্যা করিয়াছে, হত্যা করিয়াছে। রমণীর বল না থাকিলে কি তাহারা তাহা করিত? এ জগতে রমণীর মোহে যত প্রতিভা শৈশবে নষ্ট হইয়াছে, যত ধন বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে, যত যশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—তত আর কিসে হইয়াছে? সে প্রতিভায় জগতের কত উন্নতি হইতে পারিত, সে অর্থে কত জনের দুঃখ নিবারিত হইতে পারিত; সে যশে কত জনের জীবন সুখসমুজ্জ্বল হইতে পারিত! রমণীর জন্য কত জন ভগ্নহৃদয়ে অকালে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, কত সুখশান্তিময় সংসারে দুঃখদুর্দ্দশার অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে, জগতের কত অনিষ্ট হই-য়াছে। জগতে রমণীর মত বল কাহার?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এত দিনে।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা; ঝুরঝুর করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। রোয়াকের উপর একটা তৈলমলিন মোড়ায় বসিয়া অতুলচন্দ্র কয়টি প্রজার সহিত জমীজমার কি কথা কহিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে একটা অশোক গাছ ফুলে ফুলে লাল হইয়া গিয়াছে; এখনও সব ফুল ফুটে নাই, এখনই তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণা বাতাসে আতা-ফুলের মৃদু মিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে আকাশে এক এক দল বক উড়িয়া যাইতেছে, যেন নীল আকাশে এক একখানা শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে।

অতুলচন্দ্র প্রজাদিগকে কি বলিতেছে, এমন সময় একখানা গোযান প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। গরু দুইটার একটা একেবারে অস্থিচর্ম্মসার, একটা কিছু হাড়েমাংসে।

এক জন যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে অতুলচন্দ্রকে প্রণাম করিল। অতুলচন্দ্র তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—সে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেশ।

ভবেশ কাছারী-ঘরে যাইয়া বসিল। এক জন মুহুরী ধূমপান করিতেছিল—সে ভবেশকে দেখিয়া হুঁকাটা নামাইয়া রাখিল। ভবেশ সেখানে বসিল।

তাহার অল্পক্ষণ পরে ভবেশ উঠিয়া অন্তঃপুরে গেল। তখন তাহার "ঠাকুরমা" (অতুলচন্দ্রের মাতা) একখানা আসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। পার্শ্বে একটা বিড়াল নিতান্তই ধ্যানমগ্ন; চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন; তাহার গলা হইতে একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠিতেছে। সম্মুখে একটা প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের কুলঙ্গী কয়টা দ্রব্যাদিতে পূর্ণ।

ভবেশ প্রণাম করিলে ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি কয়বার মালা ঘুরাইয়া মালা রাখিয়া, প্রদীপটা একটু উস্কাইয়া দিয়া ভবেশকে বলিলেন, "কিরে, বাড়ীর সব ভাল ত?"

ভবেশ বলিল, "হাঁ।"

"তোর বাপ নাকি বদলী হইয়াছে?"

"হাঁ—তেজপুরে।"

"তুই যে হঠাৎ এখানে আসিলি?"

"তোমায় দেখিতে আর কি মেজঠাকুরমা।"

"তা ত বটেই। বাপ মা ত বিবাহ দিলে না, ঠাকুরমাদের লইয়াই এখন ঠাট্টা তামাসা কর—তার পর বিবি আসিলে, তখন ঠাকুরমা বুড়ীদের স্থান আঁস্তাকুড়ে আর কি। তা—বাপ মারই বা দোষ কি? বৌ সেবারও ত কত দুঃখ করিয়া গেল। সত্য সত্য তোর দাদা

অধঃপতন।

অমন হইল কেন? বয়স হইয়াছে, বিবাহ করিবে না—সে কি কথা? তোদের,—ছোট ভাইদেরও যে তাহার জন্য আটকাইয়া রহিয়াছে।"

"তা ত হইল, এখন বলি তোমাদের কি অযত্ন করিতে পারিব? তোমরা পুরাতন লোক—তোমাদেরই ত দখলি-স্বত্ব।"

"ওরে, এখন সবই বলিতে পারিস্; জানিস্ ত—

'পাগলে কি না বলে,
আকালে কি না খায়!'

তখন দেখিব—কি বলিস্।"

"কেন নূতন আসিয়া পুরাতনকে বেদখল করিবে?"

"নূতনেরই ত আদর রে; জানিস না,—

'নতূন নতূন তেঁতুলের বিচি
পুরাণ হ'লে বাতায় গুঁজি।'

পুরাতনের আবার আদর কি?"

"ঠাকুরমার মুখখানা আজও বেশ আছে। তুমি কি কবির দলে ছিলে?"

"এ বুড়া বয়সে আর সে কথা কেন? আমাদের সময় সে সব রেয়াজ ছিল না। বিবাহ করিয়া না হয় বৌকে কবির দলে দিস্। এখন ত আর কবির দল

চলে না,—থিয়েটারে দিস্। কত লোক দেখিবে আর তোকে ধন্য ধন্য করিবে।”

ভবেশ প্রকাশ্যে বলিল, “বেশ কথা।” মনে মনে বলিল, “এমন মুখ নহিলে আর তোমার জ্বালায় ঠাকুরদা দেশ ছাড়িবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।”

“এখন বাহিরে যাই” বলিয়া ভবেশ চলিয়া গেল।

ঠাকুরমা ডাকিলেন, “বৌ!”

পার্শ্বেই পাকশালা—সুধাময়ী সেখানেই ছিল। সুধাময়ী শাশুড়ীর কথা শুনিতে পাইল না। ভবেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবধি সুধাময়ী কেমন অন্যমনস্ক হইয়াছিল।

ঠাকুরমা আবার ডাকিলেন, “বৌ!”

এবার আওয়াজ সুধাময়ীর কাণে পৌঁছিল।—সে উত্তর দিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, “বড় মানুষের ঝির কি সাত বার না ডাকিলে উত্তর দিতে নাই? দুটা বেশী চাউল লও;—ভবেশ খাইবে।”

তাহার পর ঠাকুরমা আবার মালা ঘুরাইতে বসিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় অতুলচন্দ্র ও ভবেশ আহারার্থ অন্তঃপুরে আসিল। ঠাকুরমা ভবেশকে “এটা খা, ওটা খা” বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্যঞ্জনগুলি আজ আর খাইবার মত নহে। সুধাময়ী কোনটায় অতিরিক্ত লবণ

দিয়াছে; কোনটায় লবণ দিতে একেবারেই ভুলিয়াছে। শাকটা একেবারেই লবণবর্জ্জিত; মুখে দিয়া ভবেশ সেটা রাখিয়া দিল। দেখিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "তোরা আজ-কালকার ছেলে। খাইতে জানিস্ কেবল মাংস। তোর ঠাকুরদা বলিতেন—খাইতে হয়,—

'পটলের বিচি,
উচ্ছের কচি,
শাকের চাঁ,
মাছের মা,
কচি পাঁটা, পাকা মেষ,
দধির অগ্র, ঘোলের শেষ।'

তোদের এখন সবই নূতন।"

ভবেশ হাসিয়া উঠিল। অতুলচন্দ্রেরও অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভবেশ বলিল, "ঠাকুরমা, ঠাকুরদা লোকটা ছিলেন কেমন! বুড়ার জোর কপাল নহিলে আর তোমার মত স্ত্রী জুটে?"

পৌত্র পিতামহীতে এইরূপ রহস্য চলিতে লাগিল।

*

ভবেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবধি সুধাময়ী কেমন অন্য-মনস্কা হইয়াছিল। সে রাত্রে শয়নকক্ষে অতুলচন্দ্র ঘুমা-ইল; কিন্তু সুধাময়ী ঘুমাইতে পারিল না। সে ভাবিল—

একি করিলাম! ভাবিয়াছিলাম, এ প্রেম হৃদয়েই প্রচ্ছন্ন থাকিবে; যদি লয়প্রাপ্তও না হয়, তথাপি আর কেহ এ কথা জানিতে পারিবে না। কিন্তু হায়—কেন আবার দেখিলাম। দেখিলাম—আর সেই পূর্ব্বস্মৃতি আবার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু যখন দেখিলাম, তখন তাহাকে আর পাইবার উপায় ছিল না। প্রবল বন্যায় বাঁধের মত অকূল প্রেমে আমার সব বন্ধন ভাসিয়া গেল—আমিও সেই স্রোতে ভাসিলাম। অশান্ত হৃদয় শান্ত করিতে পারিলাম না; আপনা ভুলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিলাম। আর——এই যে সরল পুরুষ নিরুদ্বেগে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আমার পার্শ্বে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন,—ইঁহার প্রেমের কি এই প্রতিদান!

সুধাময়ী নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিল; তাহার হৃদয় কেমন করিয়া উঠিল। সেই সময় ঘুমের ঘোরে অতুলচন্দ্র পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। সুধাময়ীর মনে সেই নিদ্রিত সরল-হৃদয় স্বামীর প্রতি কেমন একটা ঘৃণার উদ্রেক হইল।

যাহার উপর আন্তরিক ভালবাসা থাকে না, তাহাকে ভালবাসা দেখানর মত যন্ত্রণা আর নাই। সেই যন্ত্রণা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি ঘৃণার উদয় হয়। ঘৃণা যখন তীব্র হইয়া উঠে, তখন রমণী স্বামীর নিকট বাস করা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। সুধাময়ীর হৃদয়ে

স্বামীর উপর সেইরূপ ঘৃণা ক্রমে প্রবল হইতেছিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া সে হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিল।

এক দিকে যেমন অতুলচন্দ্রের প্রতি তাহার ঘৃণা তীব্রতর হইতেছিল, অন্য দিকে তাহার হৃদয়ে আর একটা স্পৃহা তেমনই প্রবল হইতে লাগিল। পালে বাতাস লাগিলে তরণী যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, ভবেশ-লাভ-বাসনায় তাহার হৃদয় তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিল, মৃণাল যেমন জলতলে পঙ্কবদ্ধ মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া, জলমধ্যে কত বাধার অতিক্রম করিয়া, বাঁকিয়া চুরিয়া আসিয়া সলিলোপরি কুসুম বিকশিত করে, তাহাদের প্রেম তেমনই অতীত-বদ্ধমূল হইয়া এত বাধার অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে আসিয়া বিকশিত হইতে পারিবে কি? পারিলেই কি সে সুখী হইবে? তাহাও ত বোধ হয় না। কলঙ্কলাঞ্ছনা এ জীবনে আর ঘুচিবে না। আর তাহা হইলে সে আত্মসুখের জন্য ভবেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি, আশা, সকলই নষ্ট করিবে, তাহার জীবন অসুখময় করিবে। তাহার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, সকলে তাহাকে ঘৃণা করিবে, সে সংক্রামক-রোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু—সে প্রেমসুখ, জগতে তাহার তুলনা আছে কি?

যাহা যত দুষ্প্রাপ্য, মানবের নিকট তাহা তত বাঞ্ছ-

নীয়; ভবেশ-লাভ তাই আজ সুধাময়ীর নিকট এমন বাঞ্ছনীয়। আর সে প্রেমে একটা মুক্ত বন্ধন-বিহীনতা ছিল, যাহা দূর হইতে বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল। সুধাময়ী ভাবিল,—ভবেশ-লাভই জগতে স্বর্গসুখ। সে ভাবিল,—কে কবে আঁচল দিয়া আগুন ঢাকিয়া রাখিতে পারিয়াছে? এ প্রেম আমি কেমন করিয়া ঢাকিয়া রাখিব? এ বাসনায় যে হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে; ইহা কি লুকাইয়া রাখিতে পারি?

হতভাগিনী বাসনাস্রোতে ভাসিল; এক বার সকল দিক ভাবিয়া দেখিল না। সে রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল না।

বসন্তের কুসুম-সুরভি-বাহক-পবন-সেবিত, বিহগ-বিরাবিত, সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে নানা দুশ্চিন্তা লইয়া সে শয্যাগৃহ ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গ না নরক?

সমস্ত দিন সুধাময়ী অস্থির হইয়া রহিল। মধ্যাহ্নে আহারান্তে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, অতুলচন্দ্র যাহাতে তাহার অস্থিরতা লক্ষ্য করিতে না পারে, সে তাহার জন্য চেষ্টিতা হইল।

শয়নগৃহে আসিয়া অতুলচন্দ্র দেখিল, সুধাময়ীর মুখখানি বেশ প্রফুল্ল; কিন্তু সে লক্ষ্য করিতে পারিল না যে, সে প্রফুল্লতা স্বাভাবিক নহে, তাহা কৃত্রিম। বিষয়ী অতুলচন্দ্র তখন কোন একটা প্রজার খানিকটা বিলেন জমী খাস করিয়া লইবে, তাহাই ভাবিতেছিল। বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল একত্র বাসে ও সর্ব্বদা দর্শনে স্ত্রীর প্রতি তাহার নূতন আকর্ষণের মোহ আর ছিল না; কাজেই স্ত্রীর সকল ব্যবহার এখন আর সে তেমন করিয়া লক্ষ্য করিত না।

সুধাময়ীর সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়া, গোটা দুই রহস্য বিনিময় করিয়া, কি একটা কথায় আদর করিয়া তাহার গণ্ডে একটা কোমল চড় মারিয়া, অতুলচন্দ্র নিদ্রার আয়োজন করিল।

অতুলচন্দ্র নিদ্রিত হইলে সুধাময়ী যাইয়া একটা বাতায়নের কাছে বসিল। অল্প দূরেই একটা পুষ্করিণী—রৌদ্র-

তপ্ত দীর্ঘ দ্বিপ্রহরে বাঁধাঘাট জনশূন্য। পুষ্করিণীর তীরে দুইটি গাভী শ্যামশষ্পোপরি শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে। আর পাহাড়ের ঠিক উপরেই একটা ফুলভরা অশোক তরু—বুঝি সেই ঘাটে গমনাগমনে কুলকামিনীদিগের অলক্তকরাগরক্ত-পাদস্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুসুমশোভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! সেই অশোক তরুর কোন্ শাখায়, সেই লোহিত ফুলরাশির অন্তরালে আপনার চিক্কণ-কৃষ্ণ-তনুখানি লুকাইয়া একটা সঙ্গীহারা কোকিল কুহু কুহু রবে প্রাণের বেদনা ব্যক্ত করিতেছে; পবনে সেই কুহু স্বর আর অদূরস্থিত কয়টা তালতরুর পত্ররাজির মৃদু মর্ম্মর ভাসিয়া আসিতেছে।

বাতায়নসম্মুখে বসিয়া সুধাময়ী কত কি ভাবিতে লাগিল। সে দেখিতে লাগিল, সরসীর নীলজলে রবিকর জ্বলিতেছে; শুনিতে লাগিল, কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে। কিছু ক্ষণ পরে কলসকক্ষে এক জন রমণী ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল—কলস নামাইয়া সে একটু দাঁড়াইল। তখন চারি দিকে কোথাও আর কেহ নাই; রমণী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া মুখে চক্ষে শীতল জল দিল, তাহার পর কলস ডুবাইল। কলস পূর্ণ করিয়া আবার অবগুণ্ঠন টানিয়া কলসকক্ষে সে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। বাঁধাঘাটের সোপানে তাহার সিক্ত-চরণ-চিহ্ন রহিল।

রবি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল। সুধাময়ী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

নিদ্রান্তে উঠিয়া অতুলচন্দ্র দেখিল, সুধাময়ী বসিয়া কি ভাবিতেছে। সে বলিল, "ভাবিতেছ কি?"

সুধাময়ী বলিল, "বেলা গেল, তবুও তুমি উঠিলে না, তাই ভাবিতেছিলাম তোমাকে জাগাইব কি না।"

"বেলা গিয়াছে বটে!—আজ অনেক ক্ষণ ঘুমাইয়াছি,—আমাকে জাগাইয়া দাও নাই কেন?"

চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে অতুলচন্দ্র বহির্বাটীতে চলিয়া গেল,—সুধাময়ীও নামিয়া গেল।

পুষ্করিণীতে গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সুধাময়ী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

সে দিন একাদশী, উপবাসী শাশুড়ী সন্ধ্যার পরেই একটু গড়াইতে গেলেন। সুধাময়ী রন্ধন সারিল। তখনও অতুলচন্দ্রের আহার করিতে আসিবার বিলম্ব আছে—সুধাময়ী আপনার শয়নকক্ষে গেল। অন্তঃপুরে দ্বিতলে দুইটিমাত্র কক্ষ—একটিতে কতকগুলা বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি, আর একটা সুধাময়ীর শয়ন-কক্ষ। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটু ছাত, তাহার পর উত্তরে দক্ষিণে পাশাপাশি দুইটা ঘর, উত্তরের ঘরে দ্রব্যাদি থাকে, দক্ষিণের ঘরটি শয়ন-কক্ষ; তাহার পর দক্ষিণে খানিকটা খোলা ছাত;

তাহার পরে বহির্বাটীর বৈঠকখানা প্রভৃতি। বৈঠকখানার দুই পার্শ্বে কয়টা কক্ষ। বাড়ীতে লোক অধিক নহে। বৈঠকখানায় বড় কেহ থাকিত না; ভবেশ আসিয়া বৈঠকখানাতেই আছে। বৈঠকখানার উত্তর পার্শ্বে অর্থাৎ অন্তঃপুরের দিকে যে ঘর, সেটা ভবেশের পিতার ভাগে পড়িয়াছে। ভবেশের পিতা বিদেশে চাকরী করেন। তাঁহার ঘর চাবি বন্ধ থাকে, ভবেশ আসিয়া তালা খুলিয়াছে। সে ঘর হইতে বাটীর অন্তঃপুরাংশের ছাতে আসিবার একটা দ্বার আছে। অতুলচন্দ্রের পিতামহের এক ভ্রাতা ছিলেন, ভবেশের পিতা তাঁহার দৌহিত্র। ভবেশের পিতামহ ঘরজামাই ছিলেন। ভবেশের পিতা ও অতুলচন্দ্র প্রভৃতিতে সম্পর্কে যতটুকু তফাৎ, ব্যবহারে আবার ততটুকুও দেখায় না।

আপনার শয়ন-কক্ষে আসিয়া সুধাময়ী শয্যায় শয়ন করিল; তাহার পর আপনার তৈলের দাগপূর্ণ বালিশটা টানিয়া মাথায় দিয়া কি ভাবিতে লাগিল। মুক্ত বাতায়নপথে তাহার কক্ষে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছে; পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মুক্ত বাতায়নে ও দ্বারপথে সরসীর তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে কোথা হইতে একটা ডাহুকের বিরাব সমীরণে কোমল হইয়া আসিতেছে। সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল।

অধঃপতন।

এমন সময় দক্ষিণের মুক্ত দ্বারপথে কে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সুধাময়ী উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দেখিল,—সম্মুখে ভবেশ! আনন্দে, আশঙ্কায়, উদ্বেগে তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুধাময়ী কথা কহিতে পারিল না।

ভবেশ বলিল, "আমায় ডাকিয়াছ কেন?"

সুধাময়ী কিছু বলিল না।

ভবেশ আবার বলিল, "এখনও আর অতীত কথা ভাবিতেছ কেন? সে স্বপ্ন কি সফল হইবার? সে কথা প্রকাশ হইলে তোমার আমার উভয়েরই সর্ব্বনাশ। সে কথা ভাবিয়া আর কেন দুঃখ পাও?—সে কথা ভুলিয়া যাও।"

এতক্ষণে সুধাময়ীর কথা ফুটিল; সে বলিল, "ভুলিবার হইলে ভুলিতাম—ভুলিব কেমন করিয়া?" সুধাময়ী হর্ম্ম্যতলে চাহিয়া রহিল।

ভবেশ বলিল, "কিন্তু অদৃষ্টের লিখন যে অন্যরূপ, সে সব যে স্বপ্ন হইয়া গেল! একবার তাহা ভাবিও।"

সুধাময়ী বলিল, "সে দোষ কি আমার? এ হৃদয় তোমার, এখানে আর কাহারও স্থান নাই। এ প্রেম তুমি ফুটাইয়াছিলে, এ প্রেম তোমারই। আমি কেন হৃদয়ে এক জনের হইয়া আর এক জনের হইলাম?"

ভবেশ বলিল, "কি করিবে, সুধা ?"

এত দিনের পর ভবেশ তেমনই করিয়া ডাকিল,—"সুধা !" সুধাময়ীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; বাত্যা-তাড়িত বারিধির মত তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সুধাময়ী আর পারিল না,—কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সুধাময়ী বলিল, "এ আগুন কেমন করিয়া নিবাই ?"

ভবেশ দেখিল সুধাময়ী কাঁদিতেছে। সে বলিল, "ছিঃ সুধা, কাঁদিও না।"

সুধাময়ীর অশ্রু দ্বিগুণ বহিতে লাগিল।

ভবেশ দেখিল, সুধাময়ীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে; সেই পরিপ্লবনেত্রার মুখে জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে। ভবেশ তাহার অশ্রু মুছাইতে গেল। সুধাময়ীর কেশগুচ্ছের সৌরভ তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিল। সেই কেশকলাপের সৌরভ, সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখের সৌন্দর্য্য, আর শতস্মৃতি, তীব্র মদিরার নেশার মত ভবেশকে বিভোর করিয়া তুলিল। সে সকল যেন ক্ষুধিত পন্নগের মত ভবেশকে আকর্ষণ করিল। সকল ভুলিয়া কত দিন পরে ভবেশ সুধাময়ীকে বাহুপাশবদ্ধ করিল, সে সুধাময়ীর আন্দোলিত হৃদয় আপনার হৃদয়ে ধরিল। সেই স্পর্শানন্দে সুধাময়ীর শরীরের প্রত্যেক শিরা উপশিরায়

শোণিতস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল—আনন্দে তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। সুধাময়ী আপনার স্বেদসিক্ত ললাটে ভবেশের তপ্তশ্বাসস্পর্শ অনুভব করিল। তাহার পর ভবেশ সুধাময়ীর অশ্রুপ্লাবিত মুখে চুম্বন করিল; অসহ্য আনন্দে সুধাময়ী সব ভুলিয়া গেল; সেই মুহূর্ত্তে সুধাময়ী হৃদয়ে তীব্র সুখ অনুভব করিল। আনন্দে সে ভবেশের মুখচুম্বন করিতে ভুলিয়া গেল। তাহার পর ভবেশের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সে অশ্রুতে কত সুখ, কত দুঃখ, কত আশা, কত নিরাশা, কত আনন্দ, কত আশঙ্কা, কত কথা, কত বেদনা, কে তাহার নির্ণয় করিবে?

তাহার পরেই সুধাময়ী ভাবিল, এ কি করিলাম?

ভবেশ ভাবিল, এ কি করিলাম?

ভবেশ আর বিলম্ব করিল না, দক্ষিণ দিকের ছাত দিয়া বহির্বাটীতে যাইয়া ছাতের দিকের দ্বার রুদ্ধ করিল।

সেই সময় কক্ষের পশ্চিম পার্শ্বের দ্বারের নিকট হইতে কে সরিয়া গেল।

শয্যায় লুটাইয়া সুধাময়ী একবার কাঁদিল, তাহার পর আবার কি ভাবিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী আনন্দের আন্দোলনে তখনও তাহার হৃদয় পূর্ণ। হায়! কত মুহূর্ত্তস্থায়ী সুখের স্মৃতি জীবনে আর অপনীত হয় না!

কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুধাময়ী চমকিয়া উঠিল; শুনিল, ক্রুদ্ধস্বরে শাশুড়ী বলিতেছেন, "ও বৌ, আজ আর খাওয়া দাওয়া নাই! গৃহস্থের ঘরের বৌ সন্ধ্যা না হইতে ঘুম কি? অত বাড়াবাড়ি, বাছা, তোমার বাপের বাড়ীতে চলে চলুক—আমার বাড়ীতে চলিবে না।" সুধাময়ী নামিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নরক।

সেই রাত্রে ভবেশ একাকী শয্যাত্যাগ করিয়া বৈঠক-খানার বারান্দায় আসিয়া বসিল। গ্রাম সুপ্ত। ঝিল্লীমুখরা রজনী,—আর জ্যোৎস্নালোক নাই। আকাশে কয়খানা মেঘ দেখা যাইতেছে—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। আকাশে তারকারাজি মেঘাচ্ছন্ন; কিন্তু বৃক্ষশিরে শত শত তারকার মত খদ্যোতকুল জ্বলিতেছে। কেবল বাড়ীর পশ্চাতে সরসীকূলে ভেক দল জল-লাভ-আশায় সাগ্রহে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে; আর কোন দূর গৃহে এক জন বিনিদ্র যুবক গ্রাম্যস্বরে গাহিতেছে,—

"ওহে বনমালী! তোমার বনমালা গলে কই?
(তোমার) যে চূড়াতে রাধা-নাম সে চূড়া বা কই?"

স্তব্ধ রজনীতে সেই গীতস্বর সুপ্ত গ্রামখানির মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ভবেশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—কি করি? এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সব ছাড়িব, না এখনও ফিরিব? এখনও ফিরিবার পথ আছে; কিন্তু ইহার পর আর থাকিবে কি?

তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি উথলিয়া উঠিল। প্রথম যৌবনে পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুগৃহে একটি বালিকার সহিত

সেই সাক্ষাৎ; সেই প্রথম ঔৎসুক্য, তাহার পর আকাঙ্ক্ষা, তাহার পর আসক্তি, তাহার পর উভয়ের হৃদয়ে সেই প্রেমসঞ্চার। সে সকল আজ স্বপ্ন। কালস্রোতে দুই জনে দুই দিকে ভাসিয়া গেল, এ জীবনে দুই জনে আর সাক্ষাৎ না হইলেই বুঝি ভাল হইত। কিন্তু তাহা ত হইল না! দুই জনে আবার দেখা হইয়াছে; দুই জনের নিয়তি দুই জনকে একই স্থানে আনিয়াছে—এত কাছা-কাছি—তবুও দু' জনের মধ্যে এত ব্যবধান! যদি সুখ নাই, তবে সুখের এ ছলনা আর কেন? সে কথা ভুলিবার নহে, সে স্মৃতি মুছিবার নহে। জীবনের এক একটা ঘটনার স্মৃতি কি অপনীত হইবার? জলের লেখা সহজে বিলুপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু রক্তের লেখা কি সহজে অপনীত হয়? প্রস্তরে ছায়া পড়িলে তাহা শীঘ্রই অপসৃত হয়; কিন্তু প্রস্তরে রেখা কাটিলে তাহা কি সহজে অপনীত হইবার?

ভবেশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আকাশে এক এক-খানা করিয়া মেঘসমাগম হইতে লাগিল। তাহার পর বাত্যা ও বারিপাত আরব্ধ হইল; ঘন ঘন বিদ্যুদ্বিকাশ হইতে লাগিল; মেঘগর্জ্জনে সেই জীর্ণ অট্টালিকা যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল; হুহু করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। ভবেশ ভাবিল, যদি ঐ বন্ধনবিহীন বাতাসের

মত উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সব বাধার অতিক্রম করিয়া যেখানে শান্তি পাওয়া যায়, সেখানে যাইতে পারি! রাস্তায় একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডাল মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; একটা ঝাপ্টা বাতাস ভবেশের সর্ব্বাঙ্গে জল দিয়া যেন কৌতুক করিয়া চলিয়া গেল। ভবেশ উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই স্তব্ধ গৃহে শয্যায় শয়ন করিল। মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল; বাতাস হুহু করিয়া বহিতে লাগিল। ভবেশের হৃদয়ে নানা চিন্তার উদয় হইতেছিল।

আর সুধাময়ী? যে যাতনায় সুধাময়ীর সে রাত্রি কাটিল, সে যাতনা কি বর্ণনা করিবার? তাহার যাতনা বুঝি ভবেশের যাতনা অপেক্ষাও অধিক। ভবেশ আপনার ভাবনায় আপনি মগ্ন ছিল; আর সুধাময়ীকে এত ভাবনা সত্ত্বেও আবার আপনার ভাবনা লুকাইতে হইতেছিল,—পাছে অতুলচন্দ্র তাহা জানিতে পারে। বাহিরে যেমন ঝড় বহিতেছিল, তাহার হৃদয়েও তেমনই ঝড় বহিতে লাগিল। সে ভাবিল, হায়! সে সকল শৈশবের কামনা কেন দূর হইয়া গেল? শরতের লঘু মেঘের মত সে সকল সুখ-আশা, সেই সকল বাসনা কোথায় ভাসিয়া গেল—কেন গেল? সেও কি তাহার দোষ? সে কি করিয়াছে,—যাহার জন্য তাহার এই শাস্তি? এ কি অদৃষ্টের

বিড়ম্বনা! সে রাত্রে তাহার অল্প নিদ্রাও দুঃস্বপ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিল।

তাহার পর দিবস প্রভাতে কলিকাতাস্থ পিতৃব্যপুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া অতুলচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সে দিন ভবেশের সহিত সুধাময়ীর আবার সাক্ষাৎ হইল। যেন কোনও অদমনীয় আকর্ষণে ভবেশ আবার সুধাময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সুধাময়ী আবার কাঁদিল, ভবেশও চক্ষের জল মুছিল। ভবেশ বলিল, "অদৃষ্টের এ বিরোধ সত্ত্বেও আমি কেন আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম? আর করিব না।"

সেই দিন হইতে ঠাকুরমা কেমন খিট্‌খিটে হইয়া উঠিলেন; কথায় কথায় তিনি সুধাময়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সুধাময়ী অত্যন্ত সতর্ক হইয়াও কেমন আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। সে বড় অন্যমনস্কা হইয়া পড়িতেছিল। রন্ধনের সময় সে খোলা হইতে মাছ তুলিতে বিলম্ব করিল,—মাছ পুড়িয়া গেল;—শাশুড়ী এক বার সেই 'চোকথাকী'র কন্যাকে যথাসম্ভব তিরস্কার করিয়া লইলেন। তাহার পর একখানা রেকাবী নামাইতে সে একগাদা বাসন ফেলিয়া দিল,—শাশুড়ী সেই 'শতেকক্ষোয়ারী'র দুহিতাকে আর এক বার যথাসম্ভব তিরস্কার করিয়া লইলেন। সারা দিন এমনই চলিল।

অধঃপতন।

আসল কথা ঠাকুরমার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। পূর্ব্বদিন রাত্রে ছাতে পদশব্দ শুনিয়া তিনি উপরে গিয়াছিলেন। সে সময় ছাতে কেহ আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; অতুলচন্দ্র তখনও বহির্বাটীতে, সুধাময়ী একা উপরে। তিনি তাই উপরে গিয়াছিলেন। তখন ভবেশের বাহুপাশবদ্ধা সুধাময়ী তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতেছে। সেই অবধি তাঁহার চিন্তার আর অবধি ছিল না। এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার উপায় নাই। ভবেশ ঘরের ছেলে, সুধাময়ীকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করা দুষ্কর,—বিশেষতঃ পূর্ব্বে সুধাময়ী বরাবর তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন। অতুলচন্দ্রকে এ কথা জানাইবার উপায় কি? অথচ ইহার একটা উপায় করা চাহি। লোকে এ কথা জানিতে পারিলে, লজ্জার, লোকনিন্দার আর সীমা থাকিবে না। এই সকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—তাই তাঁহার স্বভাবতঃ তীব্র রসনা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুরমার বাক্যজ্বালা ভবেশকেও সহিতে হইল। ভবেশ ভাবিল, একি, সহসা ঠাকুরমার এ পরিবর্ত্তন হইল কেন? চলিত কথায় বলে, "যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।" কাজেই অল্পে ভবেশের সন্দেহ হইল, বুঝি ঠাকুরমা কিছু সন্দেহ করিয়াছেন।

ঠাকুরমার বকাবকি দিন দিন যেন বাড়িতে লাগিল। এমনই ভাবে কয় দিন গেল।

অতুলচন্দ্র কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিল।

ভবেশ আর সেখানে থাকিল না, সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা লইয়া সুধাময়ীর দিন কাটিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

এ কি!

ক্রমে ক্রমে দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। দুই মাসে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটে নাই। সুধাময়ীর প্রতি তাহার শাশুড়ীর ব্যবহার ক্রমেই অধিক কঠোর হইয়া আসিতেছিল। প্রথম দিন-দুই সে কচ্‌কচি অতুলচন্দ্রের কাছে বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল; তাহার পর—সহিয়া গিয়াছিল। আপনার বিষয়-কর্ম্ম লইয়া অতুলচন্দ্র এখন বড় ব্যস্ত। সে উন্নতি-আশা, সে সমাজ-সংস্কার বাসনা, সে সকল উদার মত এখন দূর হইয়া গিয়াছে। এখন প্রজাপীড়নে তাহার আর আপত্তি নাই; এখন অর্থই তাহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। ক্রমে ক্রমে মিথ্যাটাও তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। তবে কথাটা এই, প্রথম বয়সে যাহার যেরূপ নাম পড়ে। প্রথম বয়সে অতুলচন্দ্রের "ভালমানুষ", "সৎলোক" বলিয়া নাম রটিয়া গিয়াছিল; তাই, এখনও তাহার প্রজারা, অর্থাৎ যাহাদের উপর অত্যাচারটা অধিক হইত, তাহারা ভিন্ন অনেকে তাহাকে "ভালমানুষ" বলিত। তাহার হৃদয়ে ক্রোধ বেশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—পরশ্রীকাতরতা পূর্ব্বে ছিল না, এখন তাহাও উদ্দীপ্ত হইতেছিল।

বৈশাখের প্রথমে সুধাময়ী পিত্রালয়ে গিয়াছে। যাইবার সময় যখন সে শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়াছিল, তখন

শাশুড়ী মুখ ফিরাইয়া ছিলেন—তাঁহার মুখ হইতে আশী-র্ব্বাদবচনও বাহির হয় নাই।

সুধাময়ী পিত্রালয়ে যাইবার কয় দিন পরে তাহার নামে একখানা পত্র আসিল। পিত্রালয় হইতে প্রায়ই তাহার পত্র আসিত; এখন সে পিত্রালয়ে, সুতরাং তাহার পত্র আসিবার সম্ভাবনা অল্প। পত্রখানা অতুলচন্দ্রের হাতে পড়িল—লেখাটা যেন সুধাময়ীর বলিয়া বোধ হইল! অতুলচন্দ্রের একটু কৌতূহল হইল। সে এক বার ভাবিল, পত্রখানা খুলিব? মনকে বুঝাইল—স্ত্রীর পত্র স্বামী দেখিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? স্বামীর নিকট স্ত্রীর কিছু গোপন থাকা উচিত নহে। স্বামীর ব্যবসা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় এমন অনেক পত্র আসিতে পারে, যাহা স্ত্রীর দেখা উচিত নহে; কিন্তু স্ত্রীর তেমন কিছুই থাকিতে পারে না; সুতরাং পত্রখানি খুলিলে কোন হানি নাই।

পূর্ব্বে হইলে অতুলচন্দ্র আপনাকে আপনি এরূপ বুঝাইতে পারিত না; কিন্তু এখন অতুলচন্দ্র আর সে অতুলচন্দ্র নাই। মানবের অধঃপতন তাহার হৃদয়ের এক পার্শ্ব আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; অধঃপতনের আরম্ভ হইলে সমস্ত হৃদয়টাই আক্রান্ত হয়। অতুলচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল।

অতুলচন্দ্র পত্রখানা খুলিল।

অধঃপতন।

পত্রখানা পাঠ করিয়া অতুলচন্দ্র প্রথমে আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে আবার পত্রখানা পড়িল। ভাবিল, ইহা কি সত্য? যাহাকে স্বর্গ জ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই কি নরক? এই নরকের কলুষিত পবনই কি আমি নন্দনের পারিজাতসৌরভসুরভিত মন্দানিল ভাবিয়াছিলাম? আমি কি অন্ধ? এখনও সবই সেই; সেই ত সে, সেই ত আমি, তবে এ কি? ইহা কি স্বপ্ন?

কোনও স্বামী সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, স্ত্রী অন্যের প্রেমাভিলাষিনী, আবার কোনও স্ত্রী সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, স্বামী অন্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষী। কারণ সে বিশ্বাসের ফল যাতনা। কেহ কি ইচ্ছা করিয়া যাতনা ভোগ করিতে চাহে? আবার সেই জন্য স্ত্রীর পরপুরুষের প্রেমলাভচেষ্টা স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে জানিতে পারে, এবং স্বামীর অপর কোন রমণীর প্রেমলাভচেষ্টা স্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে জানিতে পারে। অথচ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেই ভালবাসায় কত ভয়, কত আশঙ্কা। আবার স্ত্রীর দোষ বুঝিতে স্বামীর যত বিলম্ব হয়, স্বামীর দোষ বুঝিতে স্ত্রীর তত বিলম্ব হয় না; কারণ, স্ত্রী স্বামীর সহস্র খুঁটিনাটি যেমন করিয়া লক্ষ্য করেন, স্বামী স্ত্রীর সকল খুঁটিনাটি তেমন করিয়া লক্ষ্য করিতে পারেন না।

অবশ্য যে দম্পতী পরস্পরের সকল কার্য্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

কলে চালিত পুত্তলিকার মত স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া, অতুলচন্দ্র শয্যার আশ্রয় লইল। দারুণ দুশ্চিন্তা-বিষে জরজর হইয়া সে কেবল ভাবিতে লাগিল,—ইহা কি সত্য? সেদিন আর ছমির শেখের দরুণ জমার ফলকরের বন্দোবস্ত হইল না। সে দিন অতুলচন্দ্র আর কোন কার্য্য করিতে পারিল না।

দুশ্চিন্তায় সে রাত্রেও অতুলচন্দ্রের নিদ্রা হইল না। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বক্ষে বিষধর রাখিয়া কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? এ কথা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না, অথচ অবিশ্বাস করিবার পথ কই?

অতুলচন্দ্র ভাবিল, যদি সত্যই ইহা স্বপ্ন হইত! কিন্তু হায়, এ কি? অতুলচন্দ্র পকেটে হাত দিল—সেই পত্র! অতুলচন্দ্র আবার সেখানা পাঠ করিল। তাহার পর ভাবিতে লাগিল—পত্রখানা দেখিয়া বোধ হয়, ইহা এক-খানা পত্রের উত্তরে লিখিত; তাহা হইলে এ পত্র সুধাময়ীর পিত্রালয়ে না গিয়া এখানে আসিল কেন? মজ্জমান ব্যক্তি যেমন জলোপরি ভাসমান তৃণখণ্ডও শেষ আশ্রয় ভাবিয়া অবলম্বন করে, অতুলচন্দ্র তেমনই এই সামান্য চিন্তার অবলম্বন লইল। তবে এ মিথ্যা!

কিন্তু তখনই আবার হৃদয়ের কোন্ কোণ হইতে যেন কে বলিল,—হয় ত সুধাময়ী পত্রে ঠিকানা দিতে ভুলিয়াছে, তাহার পিত্রালয়ে গমনের কথা লেখে নাই, তাই সে কথা জানিতে না পারায় ভবেশ এখানে পত্র লিখিয়াছে। মূর্খ! সে কথাটা কি একেবারেই অসম্ভব?

আশার ক্ষীণ আলোক নিবিয়া গেল। আবার অতুলচন্দ্রের হৃদয়ে নিরাশা ও দুশ্চিন্তার ঘনান্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

পরিশেষে অতুলচন্দ্র সঙ্কল্প করিল, যেমন করিয়াই হউক, ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবে। ভবেশ এখনও কলিকাতায়; সুতরাং তাহার প্রথম গন্তব্য স্থান—কলিকাতা।

পর দিবস অতুলচন্দ্র কলিকাতায় যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মেঘ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাশা।

বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্নের উষ্ণ-পবনে রাজপথে লাল ধূলায় পথিক জ্বালাতন হইয়া উঠিতেছে। আকাশ নীল। সেই অনন্তপ্রসারিত নীলিমায় আপনার ক্ষুদ্র দেহ মিশাইয়া কাতরকণ্ঠে চাতক ডাকিতেছে,—'ফটিক-জল'; তৃষ্ণায় বিহগের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাই সে জলদের যথাসম্ভব নিকটে গিয়া এক বিন্দু জল প্রার্থনা করিতেছে। পথে মধ্যে মধ্যে দুই একখানা জীর্ণ অশ্বযানের ঝড়ঝড় শব্দ শ্রুত হইতেছে। আর সেই ক্লান্তিকর রৌদ্রদীপ্ত পথে দুই একখানি গোযানের গাড়োয়ান ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিচিত্র সুরে গান গাহিয়া গরু তাড়াইতেছে। সেই পরুষ কণ্ঠে বিচিত্র স্বরে গান উঠিতেছে, "ও—পাগোল করেছে আমায় বনের মশা"—আর সেই গানের মধ্যে মধ্যে গাড়োয়ান, "ডানি," "বাঁয়" বলিতে বলিতে গরু দুইটাকে গমনের দিক নির্ণয় করিয়া দিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে গরু দুইটার বিরললোম লেজ মর্দ্দনও চলিতেছে। পিতৃগৃহের অন্তঃপুরে একটি কক্ষে বসিয়া সুধাময়ী। বাতায়নপথে একটা পানা পুকুর, আর তাহারই তীরে কালকাসন্দা ও বিলাতী ভেরাণ্ডার জঙ্গল দেখা যাইতেছে। সেই পুষ্করিণীর তীরে

একটা খঞ্জন পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া এ দিক ও দিক ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে; আর পুষ্করিণীকূলে একটা অশ্বত্থ তরুর একটা শাখায় বসিয়া শালিকদম্পতি প্রেমালাপে মগ্ন। পুষ্করিণীটা পূর্ব্বে বোধ করি চতুষ্কোণ ছিল, এখন আর তেমন নাই, আকারটা প্রায় গোল হইয়া আসিয়াছে। জল প্রায় দেখা যায় না—পানায় পূর্ণ। পাড়ার মেয়েরা যখন সেখানে বাসন মাজিতে আইসে, তখন তাহারা এক এক স্থানে পানা সরাইয়া লয়; তাহার পর বাতাসে একটু একটু করিয়া জলরাশি আন্দোলিত হইয়া আবার সে স্থান পানায় আবৃত হয়; একখণ্ড হরিত বস্ত্রের মত পানায় সে পুষ্করিণী আবৃত হইয়া যায়।

রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্নে একাকিনী বসিয়া সুধাময়ী ভাবিতেছে—আজও পত্রের উত্তর আসিল না কেন? ভবেশ কি কলিকাতা হইতে কোথাও চলিয়া গিয়াছে? যদি কোথাও গিয়া থাকে, তবে সে কথা একবার তাহাকে জানাইয়াও গেল না? হায়! পুরুষের ভালবাসা এমনই! সে যে জলের উপর আলিপনা, তাহা মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়। যে প্রণয়ে রমণী-হৃদয় চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, সে প্রণয়ে কি পুরুষের কিছুই হয় না! পুরুষের প্রেম কি এমনই! হায়, সে যেমন প্রাণ দিয়া ভবেশকে ভালবাসে, ভবেশ কি তাহাকে

তেমন ভালবাসে? যাহার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই, হৃদয় তাহাকে তবুও ভালবাসে কেন? ভালবাসা কি ইচ্ছার অধীন? হৃদয় কি কাহারও ইচ্ছায় স্বীয় পথ স্থির করে? সব যায়, তবুও ভালবাসা যায় না কেন?

সুধাময়ী জানিত না যে, ভবেশ তাহার পত্রের উত্তর দিয়াছে, এবং সেই পত্র পাইয়াই তাহার স্বামীর হৃদয়ে সন্দেহাগ্নি জ্বলিয়াছে।

যে কক্ষে বসিয়া সুধাময়ী এইরূপ ভাবিতেছিল, সেই কক্ষের একটা বাতায়নে দাঁড়াইয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিও গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। জানালার উপর একটা বোল্‌তা বসিয়াছিল; সেটাকে দেখিয়া সে ভাবিতেছিল, "ধলি ত কাম্‌লায়—মালি ত মলে দায়; কি কলি?" অর্থাৎ, ওটাকে যদি ধরি, তবে দংশন করে; আর যদি মারি, তবে ওটা মরিয়া যায়; এখন কি করি? তাহার পর সে স্থির করিল, "হাততালি দিই—উলে যাক্!" অর্থাৎ, হাততালি দিই উড়িয়া যাউক। সঙ্কল্প স্থির হইবামাত্র কর্ম্মে রত হওয়া। তাহার করতালিধ্বনিতে বোল্‌তাটা উড়িয়া গেল—সুধাময়ী চমকিয়া উঠিল; সে হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

সুধাময়ী আবার ভাবিতে বসিল।

কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে সুধাময়ীর চক্ষু টিপিয়া

ধরিল। সুধাময়ী বলিল, "সুভাষিণী।" তখন সুভাষিণী সুধাময়ীর চক্ষু ছাড়িয়া, হাসিয়া উঠিল।

সুধাময়ী বলিল, "এই যে বিনি দিদিও এসেছিস্!"

সুধাময়ীর পিত্রালয়ের পশ্চাতে যে পুষ্করিণী, তাহার অপর কূলের অদূরেই সেরেস্তাদার রাম বাবুর বাসা; বিনোদিনী ও সুভাষিণী রাম বাবুর কন্যা। তাহারা প্রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্নেই সুধাময়ীর কাছে আসিত। বিনোদিনীর বয়স অষ্টাদশ, সুভাষিণীর পঞ্চদশ।

সুভাষিণী বলিল, "আজ আর রাঙ্গাদিদি আসিল না, আয়, আমরাই গোলামচোর খেলি।"

কুলঙ্গী হইতে তাস পাড়িয়া তিন জনে হর্ম্ম্যতলে বসিয়া গোলামচোর খেলিতে আরম্ভ করিল।

উপরি উপরি তিনবার সুধাময়ী চোর হইল।

সুভাষিণী বলিল, "কি লো—গোলাম যে আর তোকে ছাড়িতে চাহে না?"

বিনোদিনী বলিল, "তাতে সুধার কপাল ভাল। জামাইবাবু গোলাম হইয়াই আছেন। এই দুই দিন সুধা আসিয়াছে, এই দেখ্ না, গোলাম ছুটিয়া আসে আর কি!"

সুধাময়ী বলিল, "দিদি, কেন আর নিজের কথাটা পরের ঘাড়ে চাপাও? এর পাতে দাও, ওর পাতে দাও,

তার মানে আমার পাতেই দাও। স্বামী গোলাম করি-বার ক্ষমতা তোমার বেশ আছে।"

বিনোদিনী বলিল, "ওরে, আমাদের এখন আর গুমোর কি? ছেলেপুলের মার আর গুমোর কিসের? তোদের এখনও আস্ত কাল পড়িয়া আছে; আমরা দেখি, আর হাসি।"

"কেন, হিংসায়ী নাকি?"

"দূর হতভাগী! পরের গোলামের আবার হিংসা কি রে? যার তা, তার ভাল। জানিস্ ত, 'যার প্রাণ তারি কাছে।' স্ত্রীলোকের ও কথা মুখে আনিলেও পাপ। স্বামী ভালই হউক আর মন্দই হউক, স্বামী ত বটে!"

সুধাময় কিছু বলিল না।

বিনোদিনী আবার বলিল, "সুধা, যখনই আসি, দেখি, তুই ভাবিতেছিস। এত ভাবনা কিসের? কেন, জামাই-বাবুর চিঠি পাস্ নাই?"

সুধাময়ী বলিল, "না—আজ কয় দিন পাই নাই।"

"লিখেছিস্?"

"হাঁ।"

"তবে কাল নাগাইত পাইবি। বোধ হয় জামাই বাবু ব্যস্ত আছেন।"

এই সময় কক্ষমধ্যে আর এক জন রমণী প্রবেশ

করিলেন—ইনিই রাঙ্গাদিদি। রাঙ্গাদিদি স্থূলদেহভারে মন্দগামিনী—হেলিতে দুলিতে আসিলেন; পরিধান হাতী-পেড়ে শাড়ী; বর্ণটি নিকষকৃষ্ণ; তাম্বূলরাগে ওষ্ঠাধর রক্ত-বর্ণ। বিনোদিনী পরিহাস করিয়া বলিত যে, রাঙ্গাদিদির ওষ্ঠাধর দেখিলে মনে হয়, যেন কে টিকায় অগ্নি ধরাইয়া রাখিয়াছে। রাঙ্গাদিদির স্বামী আদালতের পেস্‌কার—তাঁহার বাসা রাম বাবুর বাসার পার্শ্বেই; রাঙ্গাদিদি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী, বয়স প্রায় ত্রিশ হইবে। রাঙ্গাদিদি বন্ধ্যা,—তিনি পাড়ার মেয়েদের সরকারী 'রাঙ্গা-দিদি।' রাঙ্গাদিদি ঝোলেও আছেন, অম্বলেও আছেন;—প্রবীণা-মহলেও তাঁহার চলাফেরা, নবীনা মহলেও তাঁহার খাতির যত্ন। পিঁড়িতে আলিপনা দিতে, 'ছিরি' প্রস্তুত করিতে, কনেকে বরের সহিত আলাপ করিবার প্রণালী শিখাইতে তিনি সিদ্ধহস্ত। রাঙ্গাদিদি নামটা বিনোদিনী দিয়াছিল।

রাঙ্গাদিদি আসিলে সুধাময়ী বলিল, "তবুও ভাল রাঙ্গাদিদি, মনে পড়িয়াছে!"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "হাঁ—লো নাৎনি হাঁ। আগে এক ঘরের গৃহিণী হও, তাহার পর বুঝিবে। এখন কেবল রঙ্গরসের বয়স। তোমাদের কথা আর আমার কথা কি এক?"

বিনোদিনী বলিল, "তোমার কি কাজ? কেন, আজ দাদামহাশয়ের আদালত নাই?"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "বুধবারে আদালত নাই কেন?"

"তবে তোমার কিসের ঝন্‌ঝাট?"

"সব গুছাইয়া তবে ত আসিতে হয়।"

"কি গোছান? দাদা মহাশয় আসিবেন—সেই পাঁচ-টার পর। আমারই বরং ঝন্‌ঝাট—খোকাকে দুধ খাওয়া-ইয়া, খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া, তবে আসিতে পারি।"

রাঙ্গাদিদির চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিল; তিনি বলি-লেন, "তেমন কপাল কি করিয়া আসিয়াছিলাম, দিদি, যে ছেলে কোলে পাইব? তাহা হইলে ত এ পোড়া প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হইত।"

রাঙ্গাদিদির বড় দুঃখ ছিল যে, তাঁহার একটি সন্তান হয় নাই। বন্ধ্যা নারী সত্যই বড় দুঃখিনী।

সুভাষিণী বলিল, "ব'স, রাঙ্গাদিদি, গ্রাবু খেলি। আজ আবার মা সকাল সকাল বাড়ী যাইতে বলিয়া দিয়া-ছেন।"

বিনোদিনী বলিল, "রাঙ্গাদিদি; আজ তুমি সুধাকে খুব বাঁচাইয়া দিলে। তিন বার চোর হইয়াছে; সাত বার হইলেই মাথায় টোকা দিতাম।"

সুধাময়ী বলিল, "কাজেই—তিন বার হইলে সাত বারের

আর বাকি কি রহিল! এ বার যে গোলাম তোমার হাতে ছিল।”

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, “আপনার চুক কি কেহ দেখিতে পায়?”

সকলেই হাসিল।

তাহার পর গ্রাবুখেলা আরম্ভ হইল। সুধাময়ীর খেড় হইলেন খোদ রাঙ্গাদিদি। প্রথমবারেই রাঙ্গাদিদি একখানা কাগজ ধরিয়া বলিলেন, “দেখিস্, বিনি, এই কাগজে পঞ্জা হবে। সুধাকে ছেলেমানুষ পেয়ে তুই বোনে কেবল ফাঁকি দিতেছিলি।” তিনি সুভাষিণীকে বলিলেন, “এখন কাট্।”

সুভাষিণী কাটিল, হরতনের গোলাম। বিনোদিনী বলিল, “দুর হাবলি, একেবারে গোলাম কাটিলি?”

হাসিয়া রাঙ্গাদিদি বলিলেন, “কপালে করে।”

রাঙ্গাদিদি কাগজ বিলি করিতে লাগিলেন।

বাহিরে “আগুন! আগুন!” রব উঠিল।

হাতের কাগজ ফেলিয়া রাঙ্গাদিদি উঠিলেন; বিনোদিনী, সুভাষিণী, সুধাময়ীও উঠিল। সকলেই ছাতে চলিলেন। মন্দগামিনী রাঙ্গাদিদি সকলের অগ্রে রওনা হইয়াও সকলের পরে সেই রৌদ্রদীপ্ত ছাতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ছাত তখন রৌদ্রতাপে এমনই তপ্ত যে, পা পাতিতেও কষ্ট হয়; আবার মাথার উপর তেমনই দীপ্ত সূর্য্য। চিলা-

ঘরের পার্শ্বে একটু ছায়া ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারা গৃহদাহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাটীর আর সব মহিলারাও আসিলেন।

রাস্তার অপর পার্শ্বে দুইখানা বাড়ীর পরে, কতকগুলা খড়ের ঘর—সেখানে অগ্নি জ্বলিয়াছে। রৌদ্রতাপ-তপ্ত গৃহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, পবনসহায় হুতাশন চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। অগ্নির লোলজিহ্বা শিখা এক চাল হইতে অন্য চালে যাইতেছে—সে চাল ধরিয়া উঠিতেছে। উষ্ণ বাতাস চারি দিকে প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা দমকা বাতাসে অগ্নি আরও ছড়াইয়া পড়িতেছে—সে বাতাস সেই ছাতে দর্শকদিগকেও ক্লিষ্ট করিতেছে। রাস্তায় লোক জমিয়া গিয়াছে—যত লোক জমিয়াছে দেখিতে। দুই চার জন কলস সংগ্রহ করিয়া সুধাময়ীর পিতৃগৃহ-পার্শ্বস্থ সেই পানাপুকুর হইতে জল লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গাত্র বহিয়া স্বেদ ও জল পড়িতেছে। গৃহবাসীরা জীবন-সঙ্কটাপন্ন করিয়াও প্রজ্বলিত গৃহমধ্য হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিতেছে। এক জন চীৎকার করিয়া একটা ঘরের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিল—এক খণ্ড প্রজ্বলিত বংশ তাহার পৃষ্ঠে পড়িয়াছে—সে স্থানটা পুড়িয়া গিয়াছে। দুই এক জন রমণী সেই সর্ব্বনাশের সময় উচ্চ রোদনে গগন পূর্ণ করিতেছে;

আবার পথের দুই চার জন লোক বলিতেছে, "মর্ মাগী—যাহা পারিস্ বাহির কর। কাঁদিলে কি হইবে?"

সেই প্রখর রৌদ্রতাপে সকলে অধিকক্ষণ ছাতে থাকিতে পারিলেন না—নামিয়া আসিলেন।

বিনোদিনী ও সুভাষিণী গৃহে গেল।

রাঙ্গাদিদি সুধাময়ীকে বলিলেন, "আয় সুধা, তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।" তাহার মাতাকে বলিলেন, "কি, বৌ, মেয়ের চুলটা বাঁধিয়া দিবে, তাও কি অবসর পাওনা না কি?"

সুধাময়ীর চুল বাঁধিয়া দিয়া রাঙ্গাদিদি গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সুধাময়ী গা ধুইতে গেল।

গা ধুইয়া আসিয়া সুধাময়ী ভাবিতে বসিল। সে ভাবিতে লাগিল, আমি কাহার আশায় পথ চাহিয়া আছি? হায়, তাহাকে কি পাইব? কেমন করিয়া পাইব? আমি বৃথা প্রতীক্ষায় কেন সময় কাটাইতেছি? আর সেই সরলহৃদয় স্বামী, প্রাণের কি পূর্ণ আবেগেই তিনি আমাকে ভালবাসেন! যেদিন সেই পত্রখানা দেখিতে পাইলেন, সে দিন আমার ভয় হইয়াছিল, বুঝি তিনি সব বুঝিতে পারিলেন; সে দিনও আমার দুই বিন্দু অশ্রুতে তাঁহার সকল সন্দেহ, সব রাগ ভাসিয়া গিয়াছিল। হায়!—আমি যদি তাঁহাকে সে প্রেমের প্রতিদানে এক বিন্দু

ভালবাসাও দিতে পারিতাম; তাহা হইলে এ তাপদগ্ধ হৃদয়ও কিছু শান্ত হইত, তিনিও সুখী হইতেন। সে অসীম প্রেমের প্রতিদানে আমি তাঁহাকে দিয়াছি কেবল ঘৃণা। যাহাকে পাইব না, আমার নিকট হইতে দূরে যাইতে পারিলেই যে নির্ভয় হয়, তাহার আশায় না থাকিয়া কেন প্রেমময় পতির প্রেমরাজ্যে ফিরিয়া যাই না!

ভাবিতে ভাবিতে সুধাময়ীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই কি সেই!

শেষ রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রভাত। এখনও আকাশে দুই একখানা বিগলিতাম্বু মেঘ দৃষ্ট হইতেছে। বাতাস একটু শীতল হইয়াছে; পবনে এখনও সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ অনুভূত হইতেছে। কলিকাতার একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে, কর্দ্দমময় পথে সহিসেরা একখানা বড় ব্রুম্ গাড়ীর ঘোড়া দুইটাকে সাজ-মুক্ত করিতেছে। ওয়েলার-যুগল স্থির হইয়া বন্ধন-মুক্তির প্রত্যাশা করিতেছে, কেবল এক একবার সতৃষ্ণ-নয়নে অদূরবর্ত্তী আস্তাবলের দিকে চাহিতেছে। গাড়ীখানার গাত্রে বহুদূর পর্য্যন্ত কর্দ্দমের ছিটা লাগিয়াছে। রাস্তার উপর বারান্দায় প্রায় চত্বারিংশদ্বর্ষীয় গৃহকর্ত্তা পদচারণ করিতেছেন।

অতুলচন্দ্র আসিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল; ভারবাহী ঝাঁকামুটে বরাবর সোজা যাইতেছিল, অতুলচন্দ্র তাহাকে বলিল, "মুটিয়া! ইধার আও।" মুটিয়া ফিরিল। অতুলচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উপর হইতে গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "কে অতুল না কি?"

অতুলচন্দ্র উত্তর দিল, "হাঁ।"

গৃহকর্ত্তা নামিয়া আসিলেন—ইনি অতুলচন্দ্রের পিতৃব্য-পুত্র—সুধীরচন্দ্র।

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "হঠাৎ যে!"

অতুলচন্দ্র বলিল, "দেখিতে শুনিতে আসিলাম।"

"দেশে গরম কেমন?"

"খুব। এখানে কেমন?"

"আর ভাই—এখানে থাকাই দুষ্কর। আমি ত ভাবিতেছি দার্জ্জিলিং পালাই। তা তোমার বৌ দিদি শোনেন না; তিনি বলেন—মেয়ে বড় হইয়া উঠিল, এখন আমি চলিয়া গেলে ছেলে দেখা হইবে না। তাই ভাবিতেছি।"

"কেন,—কোথাও কি সম্বন্ধ হইতেছে?"

"এমন কোথাও নহে। তবে দুই চার জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে, এই পর্য্যন্ত। সুরেশের বড় ইচ্ছা, তাহার ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ হয়। ছেলেটি কিছু ময়লা; তাই ভাবিতেছি—কি করি। তোমার বৌ দিদি ত 'কালছেলে' বলিয়া একেবারে নাক শিটকাইয়াছেন।"

"মেয়ে ত তাঁহারও বটে—তাঁহার মত লইতে হয়। আর অমন মেয়ে, আমরা কাল জামাই করিবই বা কেন?"

"কাল ছেলে যদি না তরে, তবে ত বড় বিপদ দেখিতে পাই! তোমার বৌ দিদিও ত 'অমন মেয়ে' ছিলেন, কিন্তু আমার বর্ণটা ত বিশেষ সাফ নহে। তবে বুড়া বয়সে 'ডাইভোর্সড্' না হইলেই বাঁচি।"

"বৌ দিদিকে একবার কথাটা বলিয়া দেখিও।"

"সর্ব্বনাশ আর কি! তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে?"

দুই জনেই হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় সুধীরচন্দ্রের দুই পুত্র ও এক কন্যা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কন্যা শেফালিকা অতুল-চন্দ্রকে বলিল, "কাকা, কখন এলে?"

অতুলচন্দ্র উত্তর দিল, "এই, এখনই।"

"কাকিমা, ঠাকুরমা, সব ভাল?"

"সব ভাল।"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "বাঃ বাপের অপেক্ষা যে দেখি মেয়ের বুদ্ধি অধিক। আমি যে সব খবর জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি!"

অতুলচন্দ্র বলিল, "মেয়েরা ও সব খুব বুঝে।"

"তাই ত দেখিতেছি।"

সুধীরচন্দ্র আবার বলিলেন, "ভাল কথা; তোমার মহেন্দ্রকে মনে আছে?—সেই যে হিন্দু স্কুলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহার একটি ভাগিনেয় আছে—জমী-দার। তবে কলিকাতায় হয় না; একটু মফস্বলে যাইতে হয়।"

শেফালিকা বুঝিল, তাহার বিবাহের কথা হইতেছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। দিদি চলিয়া গেল দেখিয়া ভাই দুইটিও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সুধীরচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

. নানা কথার পর অতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভবেশ এখন কি করিতেছে?"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "একটা আফিসে এপ্রেন্টিস করিয়া দিয়াছি। উড়িষ্যায় একটা চাকরী জুটিয়াছিল, কিন্তু সেখানে একা যাইবে, দেখিবার কেহ থাকিবে না; তাই সে চাকরী লইতে বারণ করিয়াছি।"

সেই সময় চাপ্‌কান-পরা ভবেশ পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইল। অতুলচন্দ্রকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একবার মাথা নোয়াইয়া সে আফিসের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

* * * * *

সেই দিন মধ্যাহ্নে, ভবেশ যে ঘরে থাকিত, অতুলচন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তখন সে ঘরে আর কেহ ছিল না। সুধীরচন্দ্র দ্বিতলে; নিম্নতলে ভৃত্যগণও তখন নিদ্রিত।

অতুলচন্দ্র এক তাড়া চাবি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সে ভবেশের হাতবাক্সে চাবি ঘুরাইতে চেষ্টা করিল। প্রথম চাবিটা বড় হইল; দ্বিতীয়টা ঘুরিল, কিন্তু বাক্স খুলিল না; অতুলচন্দ্র একটু অধীর হইল। তৃতীয়

চাবিটা ঘুরিল, খট্ করিয়া শব্দ হইল। অতুলচন্দ্র বাক্সের ডালাটা টানিল, ডালা উঠিল—তাহার হৃদয় কম্পিত হইল—না জানি ইহাতে কি আছে! যদি ইহাতে সুধাময়ীর কোন পত্র থাকে—তবে হায়—অতুলচন্দ্র ভাবিতে পারিল না—তবে কি হইবে; আর যদি সেরূপ কোন পত্র না থাকে, তবুও এ জীবনে আর সন্দেহ ঘুচিবে না—ইহার অপেক্ষা সুধাময়ী মরিল না কেন?

অতুলচন্দ্র প্রথমে বাক্সে পত্র রাখিবার খোপগুলা অনুসন্ধান করিল—সুধাময়ীর কোন পত্রই নাই। ট্রের উপর কাগজপত্র ছড়ান, তাহার মধ্যেও সুধাময়ীর লিখিত কোন পত্র নাই।

অতুলচন্দ্র ট্রে তুলিল; তাহার পর আবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সে প্রথমে কয়খানা খাতা তুলিল—তাহার পর খানকতক পত্র; সেগুলা তুলিলে—

কি সর্ব্বনাশ! এ যে সুধাময়ীর হস্তাক্ষর!

একত্র সাতখানি পত্র। অতুলচন্দ্র সেগুলি সব লইল; তাহার পর আবার অনুসন্ধান করিল; আর পত্র পাইল না। পত্রগুলি লইয়া বাক্সের চাবি বন্ধ করিয়া অতুলচন্দ্র আপনার ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ঘরে যাইয়া সে পত্রগুলা পড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথম পত্রখানা খুলিয়া

দেখিল, "প্রিয়তম" পাঠ; সে পত্রখানা ফেলিয়া দিল—যেন সে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড হস্তে লইয়াছিল।

সে আবার পত্রখানা তুলিয়া লইল। এ পত্রগুলা সবই ভবেশ কলিকাতায় আসিবার পর লিখিত। প্রথম-খানায় সুধাময়ী লিখিয়াছে, "যাইয়া একখানি পত্র দাও নাই কেন? তোমার সংবাদ না পাইলে আমি অস্থির হইয়া উঠি।" বোধ হয়, ভবেশ সে পত্রের উত্তর দেয় নাই; কারণ, দ্বিতীয় পত্রে সুধাময়ী লিখিয়াছে, "আমার পত্র তুমি নিশ্চয়ই পাইয়াছ। আর কিছু না কর, মধ্যে মধ্যে তোমার শারীরিক কুশলসংবাদ দিও। সব যায়, কিন্তু স্মৃতি যায় না। সে কথা ভুলিব কেমন করিয়া?" তাহার পর সে লিখিয়াছে, "আমার নাম ও ঠিকানা লেখা ছয়খানা খাম পাঠাইলাম—তাহাতে পত্র লিখিলে, পত্র কে লিখিতেছে, কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না।" তৃতীয় পত্রে সুধাময়ী লিখিয়াছে, "তবুও একখানা পত্র লিখিলে না? যদি এমন ব্যবহার করিবে, তবে বালিকার হৃদয়ে অত আশা জাগাইয়াছিলে কেন? সেই অতীতের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। দাদার মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ভাবিয়াছিলাম,—বিধাতা আমার এক অবলম্বন লইলেন—সে কেবল অন্য এবং দৃঢ়তর অবলম্বন দান করিতে। তোমার হৃদয়ে কি এতটুকু দয়া নাই? আর কিছু চাহি

না—আর তোমাকে দেখিতেও চাহিব না; মধ্যে মধ্যে কুশলসংবাদ পাই না কেন?"

অতুলচন্দ্র পত্রখানা রাখিয়া দিল—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল।

তাহার পর অতুলচন্দ্র আর একখানা পত্র লইল। বোধ হয়, ভবেশ সুধাময়ীর তৃতীয় পত্রের উত্তর দিয়াছিল। চতুর্থ পত্রে সুধাময়ী লিখিয়াছে, "বহু দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া আমার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, তোমার সংবাদ না পাইলে আমি কিরূপ ব্যস্ত হই? আমি সকলের কাছে অপরাধিনী—দোষ আমার নহে, দোষ অদৃষ্টের। সে কথা আর বলিব না; যাহা হইবার হইয়াছে—এক একখানা পত্র লিখিও, আর কিছু চাহি না।" পঞ্চম পত্রে সুধাময়ী লিখিয়াছে, "আজ সাত দিন তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছি। তোমার কি এতটুকুও অবসর নাই? আর কিছু না হউক; শুধু 'আমি ভাল আছি' এটুকুও কি লিখিতে পার না? আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।"

অতুলচন্দ্র কি ভাবিল; তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, কপালে শিরা সকল ফুলিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া সে আবার আর একখানা পত্র পড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব পত্রের উত্তরে ভবেশ কি লিখিয়াছিল, জানিবার উপায়

নাই; উত্তরে সুধাময়ী লিখিয়াছে, "তোমার পত্র পাই-লাম। সত্যই এমন বাসনা লইয়া পুড়িয়া মরার অপেক্ষা মরণই আমার মঙ্গল। আমি মরিব; কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে এক বার তোমাকে দেখিতে পাইব কি? তুমি আমাকে পূর্ব্বকথা ভুলিতে বলিয়াছ, এখানে আসিয়াও তাহাই বলিয়াছিলে;—ভুলিবার হইলে ভুলিতাম। ভুলিলে তুমিও বাঁচিতে, আমিও বাঁচিতাম। কিন্তু ভুলিতে যে পারি না! তুমি লিখিয়াছ, 'তোমার দাদার কথা ভাবিয়া দেখ,—তোমার এ ব্যবহারে তাঁহার প্রেতাত্মা ব্যথিত হইতেছে।' তোমার পত্র পড়িয়া কত কাঁদিয়াছি, বলিতে পারি না। দাদা থাকিলে আজ আমায় এ নরকভোগ করিতে হইত না। আমি ত বাসনা নিবাইতেই চাহি; বলিয়া দাও, কেমন করিয়া এ বাসনা নিবাইব—আমি নিবাইব।" পত্রে কয় ফোঁটা অশ্রুচিহ্ন বিদ্যমান।

পরপত্রে সুধাময়ী ভবেশকে কেবল পত্র লিখিতে বলি-য়াছে; সে লিখিয়াছে, "এক বার সংবাদ দিও,—একখানা পত্র দিও। আমি সব আশা ত্যাগ করিয়াছি; সব বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি; আর কিছু চাহি না, কেবল তোমার সংবাদ চাহি।"

অতুলচন্দ্র দেখিল, সত্যই শেষ পত্রে সুধাময়ী লিখিতে ভুলিয়াছে যে, সে পিত্রালয়ে গিয়াছে। তাই ভবেশ

তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিয়াছে।

পত্র কয়খানা পাঠ করিয়া অতুলচন্দ্রের মনে ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে পারিল না যে, হয় ত সুধাময়ী চেষ্টা করিয়াও হৃদয় হইতে বাল্যপ্রেমের স্মৃতি অপনীত করিতে পারিতেছে না। সে বুঝিতে পারিল না যে, যাতনা, মর্ম্মব্যথা সুধাময়ীরও অল্প হয় নাই। সে একের পত্নী, অন্যে তাহার হৃদয় সমর্পিত,—তাহার উপর অতুলচন্দ্রের এতটুকু দয়া হইল না।

অতুলচন্দ্র ভাবিতে লাগিল—সত্যই রমণীর বচনে মধু, হৃদয়ে হলাহল—রমণী পয়োমুখ বিষকুম্ভমাত্র। আরব্য-উপন্যাসে বর্ণিত রমণীর সকল কলঙ্ককাহিনী তাহার সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে ভাবিল, প্রথম প্রণয়ে রমণী প্রণয়ীকে ভালবাসে, তাহার পর সে কেবল প্রেমই ভালবাসে—বায়রণের এ কথা বড় সত্য। রমণীকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতে হয়। অবরোধই রমণীর প্রকৃত স্থান। হৃদয়ে এমন পাপ লইয়া সুধাময়ী তাহার সহিত প্রেমাভিনয় করিয়াছে! আর সে এমনই মূর্খ যে, সেই অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। বিধবার নির্জ্জলা একাদশীর পালন, শৈশব-বিবাহ, সবই আজ তাহার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল;

আপনার প্রবল যাতনানলে, তাহার পূর্ব্ব মতের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। অতুল-চন্দ্র ভাবিতে লাগিল—যদি পারি, এ দেশে আবার শিশু-বিবাহ প্রচলিত করিব। সে ভাবিতে লাগিল—কি ছলনা! এত পাপ, আর আমার সহিত এত ছলনা! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই! ধিক্ আমাকে! ভাবিতে ভাবিতে অতুলচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল—উঠিয়া সে কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিল।

তাহার পর সে আপনা-আপনি বলিল, "আমিও মানুষ, আমারও রক্তমাংসের শরীর। আমি ইহার প্রতি-শোধ লইব। যদি পারি ভাল;—নহিলে এ অসার জীবন রাখিব না।"

পৈশাচিক হাস্যে তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর ভিন্ন হইল।

সে স্থির করিল, পরদিবস সুধাময়ীর পিত্রালয়ে গমন করিবে। তাহার পর সে ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহের পথে।

পরদিন অতুলচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

পথে ট্রেণে সে ভাবিতে ভাবিতে গেল, সেই পাপময়ী পত্নীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে। যেমন ঔৎসুক্য হইতে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে আসক্তি, এবং আসক্তি হইতে প্রেম, তেমনই আবার সময় সময় প্রেম হইতে উপেক্ষা, উপেক্ষা হইতে বিরক্তি, এবং বিরক্তি হইতে ঘৃণা উপস্থিত হয়। হৃদয়ের তীব্রযাতনা ও ক্রোধে কখন্ যে প্রেম উপেক্ষা ও বিরক্তি অতিক্রম করিয়া একেবারে ঘৃণায় পরিণত হইয়াছিল, অতুলচন্দ্র তাহা আপনিও বুঝিতে পারে নাই। এখন সুধাময়ীর উপর তাহার হৃদয়ে কেবল প্রবল ঘৃণাই ছিল।

অতুলচন্দ্রের মনে হইল, পূর্ব্বে একবার সুধাময়ীকে দেখিতে যাইবার সময় সে কত সুখকল্পনাই করিতে করিতে গিয়াছিল! ঘূর্ণী বায়ুতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র-রাশির মত সে সকল সুখ-কল্পনা কোথায় গেল?

ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে স্থির হইল! জীর্ণ অশ্বযানে অতুলচন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। তাহারা সহসা আগমনে কোন অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায় সুধাময়ীর হৃদয় কম্পিত হইল।

বিনোদিনীর দুইটি ভ্রাতা সুধাময়ীর পিতৃগৃহ-প্রাঙ্গণে,

তাহার ভ্রাতার সহিত খেলা করিতেছিল; তাহারা যাইয়া দিদিদের সংবাদ দিল যে, সুধাদিদির বর আসিয়াছে। শুনিয়া বিনোদিনী সুভাষিণীকে বলিল, "শুনিলি সুভা, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই—ওবাড়ীর জামাই আসিয়াছে। সাপের হাই বেদেয় চেনে, ও আমি বুঝি।" দুই ভগিনী একটু হাসিল।

সেই দিন রাত্রে সুধাময়ী দেখিল, অতুলচন্দ্রের মুখ অসম্ভব গম্ভীর; সে কখনও স্বামীর মুখ তেমন গম্ভীর দেখে নাই। সুধাময়ী স্বামীকে প্রণাম করিল,—অতুলচন্দ্র আজ আর পূর্ব্বের মত বলিল না, "থাক্—ও কেন?" সে আজ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অতুলচন্দ্র বলিল, "কাল আমি বাড়ী যাইব—আমার সঙ্গে যাইবে?"

সুধাময়ী বলিল, "কেন, বাটীতে সব ভাল ত?"

"তুমি যাইবে?"

"তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেখানেই যাইব।"

অস্ফুটস্বরে অতুলচন্দ্র বলিল, "তবুও ত আমি ভবেশ নহি।"

সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বাড়ী হইতে আসিলে?"

"না। কলিকাতা হইতে।"

"কেন?"

"গিয়াছিলাম একটা কাজে।"

"আমার পত্র কি পাও নাই?"

"পাইয়াছিলাম।"

"উত্তর দাও নাই কেন?"

"তাই ভাবিয়া ত তোমার ঘুম হইত না।"

সুধাময়ী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল—দেখিল, সেই কৃষ্ণবর্ণ বদনে তাঁহার চক্ষু দুইটা সর্পের মস্তকস্থিত মণির মত জ্বলিতেছে। সুধাময়ী ভাবিল—একি?

অতুলচন্দ্র আর কোন কথা কহিল না—শয্যায় শয়ন করিল।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল—একি?

অতুলচন্দ্র আসিয়াই শ্বশুরকে বলিয়াছিল যে, বাড়ীতে বিশেষ আবশ্যক আছে, তাই সে সুধাময়ীকে লইতে আসিয়াছে। জামাই মেয়েকে লইয়া যাইতে চাহিলে, শ্বশুরের তাহাতে আপত্তি করা ধৃষ্টতামাত্র; বরং তাহাতে অনেক সময় মনোমালিন্য ঘটে। সুধাময়ীর পিতা সে কথা জানিতেন; তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। সুধাময়ীর মাতা একবার বলিয়াছিলেন, "এই দুই দিন আসিয়াছে। দুই দিন থাকিলে হইত না?" অতুলচন্দ্র

যখ: বলিল, "না—বাড়ীতে আবশ্যক আছে," তখন তিা ও আর কিছু বলিলেন না।

পর দিবস সুধাময়ীকে লইয়া অতুলচন্দ্র নৌকাপথে যাত্রা করিল।

গ্রীষ্মের খর-রবিকরে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী এখন শীর্ণ-কায়া; জলতলে সিকতারাশি দেখা যাইতেছে। দুই তীরে কিছু দূর পর্য্যন্ত বালুকাময় তটে বালুকারাশি রবিকরে রৌপ্যের মত চক্ চক্ করিতেছে। তাহার উপর শ্যামতৃণ-মণ্ডিত ভূমি; মধ্যে মধ্যে দুই এক খানা ক্ষেতে পটল ও উচ্ছে ফলিয়াছে। তাহার উপর এরণ্ডের বেড়া-ঘেরা ক্ষেত্র—কৃষক কেবল চাষ দিয়া গিয়াছে। নৌকা চলিতে লাগিল; ক্ষেপণীক্ষেপণে নদীতরঙ্গে শত সূর্য্য ভাঙ্গিতে লাগিল, গড়িতে লাগিল। এক এক স্থানে নদীজলে কতকগুলা বাঁশ পুতিয়া ধীবরগণ মৎস্য ধরিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল বাঁশের উপর দুই চারিটা পানকৌড়ী বসিয়া আছে, আর মধ্যে মধ্যে উড়িয়া আহারানুসন্ধানে জলে ডুব দিতেছে।

নৌকায় আরোহী দুই জন মাত্র,—সে দুই জনে আবার সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ—স্বামী স্ত্রী; অথচ দুই জনে কোন কথা নাই! সুধাময়ী কয়বার কথা পাড়িবার চেষ্টা করিল; অতুলচন্দ্র বিরক্তভাবে দুই চারিটা কথা কহিয়া নীরব হইল।

তাহার আর কথোপকথনে প্রবৃত্তি নাই বুঝিয়া সুধাময়ীও নীরব হইল। স্বামীর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সুধাময়ী শঙ্কিতা হইল; এ গুমট্ দেখিয়া সে ভাবিল—বুঝি ঝড় উঠে।

অতুলচন্দ্র বড় অন্যমনস্ক, বড় চিন্তামগ্ন।

একটু বেলা পড়িলে অতুলচন্দ্র নৌকার আবৃত অংশ হইতে বাহির হইয়া বসিল। তখন স্বভাবের শোভা বড় সুন্দর, বড় নয়নমনোরম। নদীর তরঙ্গরাশি অতি ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে; তরণীতে প্রতিহত হইয়া তরঙ্গগুলি যেন ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। সে চিত্র কোন্ চিত্রকর চিত্রিত করিতে পারে? নদীতীরে কোথাও একটা বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিয়া কয়টি গাভী রোমন্থ করিতেছে; কোথাও বা একটি তরুর আনত শাখাগুলি জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; এখানে ওখানে নদীকূলে বেতসকুঞ্জ, বেতসলতাগুলি নদীর জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; নদীতীরস্থ বৃক্ষ সকল হইতে জীর্ণ পত্র জলে পড়িতেছে।

অতুলচন্দ্রের এ সকল ভাল লাগিতেছিল না। সে আপনার চিন্তাসাগরে আপনি মগ্ন ছিল। পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিত পিতৃব্যপুত্রের সংসারের কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, তাঁহার কেমন সুখের সংসার! হয় ত অপেক্ষাকৃত

অল্পবয়সে বিবাহ করিলে, তাহারও সেইরূপ সুখের সংসার হইতে পারিত। তাহা হইলে—কি সুখেরই হইত! ভাবিতে ভাবিতে অতুলচন্দ্রের বোধ হইল, যেন জগৎ তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে; সংসার তাহাকে তাহার প্রাপ্য দেয় নাই। সে সংসারের উপর এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া তবে ছাড়িবে।

ভাবিতে ভাবিতে অতুলচন্দ্রের হৃদয় রোষদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্রমে ক্রমে লোহিতাভ সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িল। আকাশে মেঘমালা যেন ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত অপ্সরার অঞ্চলের মত দেখাইতে লাগিল। নদীনীরে রবি-করের আভায় রঞ্জিত মেঘমালার প্রতিবিম্ব শোভা পাইতে লাগিল; নদীজলে যেন আর এক গগন দৃষ্ট হইতেছিল।

তাহার পর দূর প্রান্তরের পারে তরুরাজির পশ্চাতে তপন মেঘে মিলাইয়া গেল,—তরুরাজির শিরে আঁধার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে রবির উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত কর-জাল আঁধারে ঢাকিয়া গেল; চারি দিক অন্ধকার হইল। নৌকায় একটিমাত্র ক্ষুদ্র লণ্ঠন জ্বলিল।

নৌকা চলিতে লাগিল। অতুলচন্দ্র একবার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোন্ গ্রাম?"

একজন মাঝি উত্তর দিল, "হরিশপুর।"

অতুলচন্দ্র আবার চিন্তামগ্ন হইল।

নৌকার মধ্যে সুধাময়ীও একা বসিয়া নানা দুশ্চিন্তায় পীড়িতা হইতেছিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে সেই গ্রীষ্মকালেও নদীর শীকর-শীতল পবনে একটু শীত বোধ হইতে লাগিল। মাঝিরা মোটা চাদর টানিয়া গায় দিল, এবং মালসা হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিয়া থেলো হুঁকায় ধূমপান করিয়া একটু গরম হইল। নৌকা বাহিয়া চলিল। নৌকার পার্শ্ব দিয়া একখানা বড় নৌকা গেল; একজন মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার নৌকা ভাই?"

বড় নৌকার এক জন উত্তর করিল, "চাটগাঁর।"

"কি বোঝাই?"

"চিটা গুড়।"

নৌকা চলিয়া গেল।

অতুলচন্দ্রের শীতনিবারণোপযোগী গাত্রবস্ত্র ছিল না; সে নৌকার ছইয়ের মধ্যে যাইয়া শয়ন করিল।

সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী কত দূর?"

অতুলচন্দ্র কোন উত্তর দিল না।

সুধাময়ীও আর কিছু বলিল না।

কিছু ক্ষণ পরে একটা ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া মাঝিরা বলিল, "বাবু, ঘাটে এসেছি।"

অতুলচন্দ্র একজন মাঝিকে দিয়া গৃহে সংবাদ পাঠাইল। অল্পক্ষণ পরেই লণ্ঠন লইয়া এক জন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই সুপ্ত পল্লীর মধ্য দিয়া চাকর অগ্রে অগ্রে আলোক লইয়া চলিল—তাহার পর অতুলচন্দ্র ও অবগুণ্ঠনবতী সুধাময়ী, আর তাহাদের পশ্চাতে এক জন মাঝি সুধাময়ীর কাপড়ের তোরঙ্গ মাথায় লইয়া চলিল।

পল্লী সুপ্ত। দুই একখানা গৃহে দীপালোক দৃষ্ট হইতেছে। গোপগৃহে গোশালা হইতে সাঁজালের ধূম উঠিতেছে, তাহাতে মশককুল আর গরুগুলিকে বিরক্ত করিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু সেই ধূমপূর্ণ ঘরে গরুগুলি যে বড় সুখে আছে, এমন ত বোধ হয় না। বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়া শাঁ শাঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে।

নদীকূল হইতে অল্প দূরেই অতুলচন্দ্রের গৃহ। অল্পক্ষণমধ্যেই তাহারা গৃহে আসিয়া উপনীত হইল। সুধাময়ী গৃহে আসিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। শাশুড়ী কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?" শাশুড়ী বধূতে আর কোন কথাই হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদেশ-গমন।

রাত্রি প্রায় দশটা। কলিকাতার পথে কোলাহল অনেক কটা কমিয়াছে। গঙ্গাতীরে রাস্তা প্রায় জনশূন্য। সেই পথে একখানা গাড়ী খিদিরপুরের ডকের দিকে যাইতেছে। গাড়ীর ছাতে বিছানা, বাক্স প্রভৃতি নানা দ্রব্য; আরোহী এক জন মাত্র যুবক। গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গশীতল পবনেও তাহার কপালে স্বেদচিহ্ন লুপ্ত হয় নাই—তাহার নয়নেও বুঝি অশ্রু।

কয়লাঘাট ছাড়াইয়া গাড়ী চলিল। দক্ষিণে জললীলাময়ী জাহ্নবী, আজ নদীতে বাণ আসিয়াছে—বামে সুদূরপ্রসারিত ময়দান। রুদ্ধদ্বার দুর্গ বামে রহিল;—তাহার পর দক্ষিণে 'প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাট'। বামে ময়দানের আলোকসমূহ শত শত হীরকের মত জ্বলিতেছে; মধ্যে মধ্যে ময়দানে দুই একখানা গাড়ী যাইতেছে, অন্ধকারে গাড়ীখানি দেখা যাইতেছে না, কেবল বোধ হইতেছে, যেন দুইটা আলোক ছুটিয়া যাইতেছে। গঙ্গাবক্ষ হইতে অতি স্নিগ্ধ বায়ু আসিতেছে।

অশ্বযুগল যান লইয়া বেগে চলিল; গঙ্গাবক্ষে তরণীশ্রেণীর গুণে পবনের শন্ শন্ শব্দ শ্রুত হইতেছে। দূরে গঙ্গাবক্ষ অন্ধকার—যেন আঁধারে আঁধার মিশাইয়া গিয়াছে।

ক্রমে মাঠ ছাড়াইয়া শকট চলিল,—পথিপার্শ্বে দুই চারখানা দোকান দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার পর শকট দক্ষিণে ফিরিল; গাড়ী খিদিরপুরের ডকে গিয়া স্থির হইল। বিদ্যুদালোকে ডক আলোকিত; জ্যোৎস্নালোক, আর তদপেক্ষাও উজ্জ্বল তদপেক্ষাও শুভ্র বিদ্যুদালোক ডকে পড়িয়াছে। জলরাশি স্থির, তাহার উপর জাহাজও স্থির, যেন চিত্রাঙ্কিত সমুদ্রে চিত্রাঙ্কিত জাহাজ। জাহাজের চিম্‌নি হইতে ধূম উঠিয়া পবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পার্শ্বে একটা গভীর গর্ত্ত, সেখানে একখানা জাহাজের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে; কয়টা পাইপ দিয়া গর্ত্তে জল প্রবেশ করিতেছে—বোধ হয়, সংস্কারপরীক্ষা হইবে।

আরোহী যুবক শকট হইতে অবতরণ করিল। জাহাজ হইতে ভূমিতে একটা সিঁড়ি ফেলা; সেই সিঁড়ির মূলে দাঁড়াইয়া এক জন ইংরাজ চুরুট ফুঁকিতেছিল, উদ্গীরিত ধূমরাশি আঁধারে মিশাইয়া যাইতেছিল। যুবক তাহাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "এই জাহাজ উড়িষ্যায় যাইবে?"

ইংরাজ বলিল, "হাঁ—আপনি যাইবেন?"

"হাঁ।"

"কোন্ শ্রেণী?"

"দ্বিতীয়।"

behind গাহিতেছেন, আর তাঁহার অনতিদূরে সেই বাঙ্গালী বাবুটি একখানা জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া একখানা মোটা খাতায় কি হিসাব লিখিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে টেবিলে কতকগুলা টিকিট ও খানকতক খাতা ছড়ান। বিদ্যুদালোকে তাঁহার টাক চক্ চক্ করিতেছে।

এই যুবক—ভবেশ। যে দিন অতুলচন্দ্র তাহার বাক্স খুলিয়াছিল, সে দিন শনিবার; সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিয়া ঘড়ী রাখিতে বাক্স খুলিয়া সে দেখিল, কে বাক্সের কাগজপত্র নাড়িয়াছে। চাকরেরা বাক্স খুলিলে টাকা লইত; সে দেখিল, টাকাকড়ি ঠিক আছে। তাহার পর খুঁজিয়া দেখিল, বাক্সে সুধাময়ীর পত্র কয়খানাই নাই। ভবেশ ভাবিল—একি? চাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, মধ্যাহ্নে অতুলচন্দ্র ভিন্ন সে দিকে আর কেহই ছিল না। ভবেশের সন্দেহ হইল।

পার্শ্বের ঘরেই অতুলচন্দ্রের স্থিতি। ভবেশ দেখিল, সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে চাবির ছিদ্রপথে সে দেখিল, কক্ষমধ্যে অতুলচন্দ্র পদচারণ করিতেছে, তাহার মূর্ত্তি প্রলয়ঙ্কর বজ্রসহচর পার্ব্বত্য বাত্যার মত ভীষণ; তাহার হস্তে একখানা পত্র। ভবেশ বুঝিল, কোন্ পত্র।

তাহার পরদিবস অতুলচন্দ্র সুধাময়ীর পিত্রালয়ে গেল। ভবেশ ভাবিতে লাগিল—কি করি? সে ভাবিল,

—তাহার পক্ষে এখন দেশত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে হয় ত সুধাময়ীও ক্রমে তাহাকে ভুলিতে পারিবে। আর নহিলেই বা সে কেমন করিয়া অতুলচন্দ্রের কাছে মুখ দেখাইবে? সে ভাবিল,—"উড়িষ্যার চাকরী ছাড়িয়া কি ভুলই করিয়াছি!"

সোমবারে ভবেশ আফিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখনও চাকরীতে অন্য লোক নিযুক্ত হয় নাই। ভবেশ চাকরী লইতে স্বীকার করিল। 'সাহেব' হাসিয়া বলিলেন, "কি বাবু, ইহার মধ্যেই মত বদলাইল? আচ্ছা।"

সেই চাকরী লইয়া ভবেশ উড়িষ্যায় যাইতেছে। ভবেশ চিরকালই একগুঁয়ে, আপনার মনোমত কার্য্য করে। চাকরী স্থির করিয়া আসিয়া সে সুধীরচন্দ্রকে সংবাদ দিল। সুধীরচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন ও চাকরী লইতে গেলে?"

ভবেশ বলিল, "এখানে কত দিনে কি হইবে, তাহার স্থির নাই।"

"তোমার যাহা খুসি কর। আমি পূর্ব্বেই এ চাকরী লইতে বারণ করিয়াছি—আমার কায আমি করিয়াছি।"

ভবেশ কিছু বলিল না।

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "তোমার পিতার মত লইয়াছ?"

অধঃপতন।

সুধীরচন্দ্র সাধারণতঃ আপনার সম্পর্কে বলিতেন, 'দাদা', আর ভবেশের উপর বিরক্ত হইলে তাহার সম্পর্কে বলিতেন, 'তোমার পিতা'।

ভবেশ বলিল, "না।"

"তবে স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতেছ?"

ভবেশ কিছু বলিল না। সুধীরচন্দ্র রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ভবেশ জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আবশ্যক দ্রব্যাদি সবই সুধীরচন্দ্র কিনিয়া দিলেন। সুধীরচন্দ্র বড় স্নেহশীল। তাহার পর ভবেশের যাইবার দিন তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন, পঁহুছিয়াই টেলিগ্রাফ করিতে ও সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র লিখিতে বলিয়া দিলেন।

ডেকের রেলিংএর উপর মাথা রাখিয়া ভবেশ ভাবিতে লাগিল,—জন্মভূমি ছাড়িয়া, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া কোথায় চলিলাম? চলিলাম—কিন্তু প্রাণে যে জ্বালা লইয়া চলিলাম, সে জ্বালা কি জুড়াইবে? সে আশা, সে স্বপ্ন কোথায় গেল? সুধাময়ী বলিয়াছে, "দোষ কাহার?" সত্য সত্যই দোষ কি তাহার? আমার কি দোষ নাই? কেন আমি বালিকার অপ্রস্ফুট হৃদয় ফুটাইয়াছিলাম; কেন তাহার বিকাশোন্মুখ হৃদয়ের সমক্ষে আপনাকে লইয়াছিলাম? না লইয়া কি করিব—তখন কে তাহা জানিত? সুরেনের

মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দুই জনের সাক্ষাৎ—সেইখানে চিত্তবিনিময়। তাহার পর কেন আমি চলিয়া যাই নাই, কেন তাহাকে ভুলিবার অবসর দিই নাই?—আমি কি তখন জানিতাম? তখন কে জানিত, জীবনের সকল সুখের আশা নিরাশার শ্মশানে ভস্মীভূত করিতে হইবে? না—দোষ আমার—যখন জানিতাম, স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের উপায় করিতে পারি নাই,—যখন জানিতাম, আমার সমস্ত আশা অন্যের উপর নির্ভর করিতেছে, তখনও কেন নিরস্ত হই নাই?

হায়! জগতে কয় জন এইটুকু বুঝে? সকল দিক দেখিয়া সকল ভাবিয়া কার্য্য করা কি সকল সময় সম্ভবে? কয় জনের সে সামর্থ্য থাকে? কয় জন স্রোতে উজান বাহিয়া যাইতে পারে? আর প্রথম যৌবনে অতৃপ্তপিপাসাপূর্ণ হৃদয়ে কয় জন কুসুমায়ুধের অস্ত্র অতিক্রম করিতে পারে? পারিলে সেই অতীত স্মৃতি, সেই দুইটি নয়নের চাহনি, সেই দুইখানি অধরের ভাষা আজও আর হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত না। পারিলে সহধর্ম্মিণীর প্রেম, পুত্র কন্যার ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবের স্নেহ, এ সকলের মধ্যেও মাঝে মাঝে মরুভূমির তপ্তশ্বাসের মত একটা অতীত-স্মৃতি হৃদয় ক্লিষ্ট করিত না। সে আজ কোথায়? আজ তাহাকে দেখিলে চিনিতে পার না; সেও আজ

আর তোমাকে দেখিলে চিনিতে পারে না। আজ সেই পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিতা গৃহিণীকে দেখিলে চিনিতে পার না; কিন্তু সেই যে বালিকামূর্ত্তি আজও হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা মুছিতে পার কি? প্রাণের সহিত যাহা বিজড়িত, তাহা কি প্রাণ থাকিতে দূর করা যায়?

ভবেশ ভাবিতে লাগিল—আমি চলিলাম। এ জীবনে আর ফিরিব কি না, কে বলিতে পারে? সুধাময়ীর সহিত আমার আর সাক্ষাৎ না হইলে উভয়েরই মঙ্গল! আমি আমার জন্য চিন্তিত নহি,—আমি সকল সহিব। সুধাময়ী যেন আমাকে ভুলিয়া যায়। স্বামীর পবিত্র প্রণয়ে যেন তাহার তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হয়—সে শান্তি পায়।

তখন সেই দূর গৃহের কথা ভবেশের মনে পড়িল। সেই স্নেহময় জনকের কথা, সেই স্নেহময়ী দেবীপ্রতিমা জননীর কথা তাহার মনে পড়িল। আর সেই জ্যেষ্ঠ—তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইলে আজ তাহার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইত না। ভাইভগিনীদিগের সেই সব সরলতা-মাখা মুখ,—তাহাকে দেখিলে তাহাদের সেই আনন্দ! আজ সেই সকল কথা ভবেশের মনে পড়িল; ভবেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আর তাহার মনে পড়িল একটি মৃত্যুশয্যার কথা।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত শীর্ণকায় রোগী, আর সেই শয্যাপার্শ্বে—ফুল্লারবিন্দবৎ বালিকা ও এক জন যুবক। তাহার পর আবার সেই সব সাক্ষাৎ, সেই সব প্রেম-সম্ভাষণ, সেই আশা! হায়, সে সকল এখন স্বপ্ন! ভবেশ পকেটে হাত দিল, কতকগুলি পত্র বাহির করিল। কাঁচা লেখা, ভায়লেট কালি স্থানে স্থানে মুছিয়া গিয়াছে। এ সকল সুধাময়ীর পত্র। এ সকল পত্র সুধাময়ী পূর্ব্বে তাহাকে লিখিয়াছিল। ভবেশ পত্রগুলি আবার পকেটে রাখিল। পত্রগুলা অন্য বাক্সে ছিল, অতুলচন্দ্র সে বাক্স খুলে নাই।

ভবেশের নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু টল টল করিল—তাহার পর দুই ফোঁটা জল ডেকের উপর পড়িল। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা মর্ম্মবেদনা-পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া নৈশপবনে মিশিয়া গেল। রুমালে চক্ষু মুছিয়া ভবেশ ক্যাবিনে গেল। তখন ক্যাপ্টেন খালাসীদিগকে কি হুকুম দিয়া, The girl I left behind শিস্ দিতে দিতে আপনার ক্যাবিনে প্রবেশ করিতেছেন।

ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া ভবেশ দেখিল, ক্যাবিনে আলোক নাই। আলোক-কর্ণ ঘুরাইয়া সে বিদ্যুদালোক প্রজ্বালিত করিল। এক জন ইংরাজ একটা শয্যায় শুইয়াছিল; সে রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

অধঃপতন।

ভবেশ বলিল, "আমি এক জন যাত্রী।"

ইংরাজ অস্ফুটস্বরে বলিল, "শয়তান তোমাকে গ্রহণ করুন।"

কিছু না বলিয়া আলোক নিবাইয়া ভবেশ শুইয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তকথা।

যে দিন অতুলচন্দ্র সুধাময়ীকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইল, তাহার পরদিন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার জন্য শয়ন-কক্ষে যাইয়া অতুলচন্দ্র দেখিল, সুধাময়ী বসিয়া কি ভাবিতেছে। অতুলচন্দ্র উপস্থিত হইলে সুধাময়ী যেন চমকিয়া উঠিল।

বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক স্বরে অতুলচন্দ্র বলিল, "বড় ভাবনা!"

সুধাময়ী কিছু বলিল না;—অতুলচন্দ্র দেখিল, তাহার নয়নে অশ্রু। সে ভাবিল, এখনও ছলনা! রমণী মরিলেও বুঝি তাহার চাতুরী যায় না। সে আর কোন কথা কহিল না, শয্যায় শয়ন করিল।

সুধাময়ী স্বামীর পদপ্রান্তে বসিল, তাহার পর অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমি কি দোষ করিয়াছি?"

অতুলচন্দ্র বলিল, "তুমি কোন পাপ কর নাই?"

সুধাময়ী কাঁদিতে লাগিল।

অতুলচন্দ্র উঠিয়া গেল, যাইবার সময় একটু মৃদুস্বরে বলিল, "কুলটার অশ্রু!"

অতুলচন্দ্র আপনা-আপনি কথাটা বলিল, সুধাময়ীকে শুনাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, মনের আবেগে মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সুধাময়ী কথাটা শুনিল—বজ্রাঘাতের মত কথাটা সুধাময়ীর বক্ষে বাজিল।

অধঃপতন।

অল্পক্ষণমধ্যেই সিঁড়িতে অতুলচন্দ্রের চটিজুতার শব্দ শ্রুত হইল; তাহার পর অতুলচন্দ্র পুনর্ব্বার কক্ষে প্রবেশ করিল। অতুলচন্দ্র কয়খানা পত্র আনিয়াছিল; সেগুলা সুধাময়ীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এই নাও তোমার পাপের সাক্ষ্য।"

সুধাময়ী দেখিল, তাহারই হাতের লেখা; সে ভবেশকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিল, সেইগুলি! সুধাময়ী স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুধাময়ী চাহিয়া দেখিল, অতুলচন্দ্র চলিয়া গিয়াছে—সে কক্ষে সে একাকিনী। এক এক করিয়া সুধাময়ী পত্রগুলি পড়িল; তাহার পর পত্রগুলি লইয়া সে নামিয়া গেল। বাক্স খুলিয়া পত্রগুলি রাখিয়া আবার বাক্স বন্ধ করিয়া সুধাময়ী দ্বিতলে শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল—সব জানিতে পারিয়াছেন—তবু আমাকে তিরস্কারও করেন নাই! আর এমন ভালবাসার প্রতিদানে আমি পাপীয়সী দিয়াছি কেবল ঘৃণা! এই দেবতুল্য স্বামী, আর আমি পিশাচী তাঁহারি পত্নী! মরিব সেও ভাল; কিন্তু এ বাসনা নিবাইব—তাঁহার কাছে আর বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।

সুধাময়ীর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

সকলেরই জীবনে একটা একটা এমন ঘটনা ঘটে,

যাহাতে হৃদয়ের সব যেন উলট পালট হইয়া যায়; জীবনের উদ্দেশ্য নূতন হয়; জীবনস্রোত নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুধাময়ীর জীবনে আজ তেমনই একটা ঘটনা ঘটিল। সুধাময়ী নিজ হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। সে বুঝিল, হৃদয়ে এক জন যত নিকটে আসিবে, আর সকলে তত দূরে যাইবে। যদি সে অতুলচন্দ্রকে নিকটে আনিতে পারে, তবেই ভবেশ দূরে যাইবে, নহিলে নহে। সুধাময়ী ভাবিল, সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে; একবার হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেখিবে।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল,—হায়! কুক্ষণে আমি ভবেশকে দেখিয়াছিলাম, কুক্ষণে আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। কুক্ষণে বালিকা-হৃদয়ে প্রেম ফুটিয়াছিল। যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছিল;—তাহার পর কেন আমি ভবেশকে পত্র লিখিয়াছিলাম? সে আমার নিকট হইতে যতই দূরে যাইতে চাহিয়াছে, আমি তাহাকে ততই আকর্ষণ করিয়াছি। বিষধর যেমন সংহার করিবার জন্যই শিকার আকর্ষণ করে, আমি তেমনই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছি। তাহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য, আমি কুলবধূ কেন আপনা খাইয়া, সব কর্ত্তব্য ভুলিয়া, ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে আসিতে বলিয়াছিলাম? আমি আসিতে না বলিলে ত সে আসিত না?

অধঃপতন।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল,—যখন সে সকল আশা সফল হইবার নহে, তখনও কেন আবার সেই পথ চাহিলাম? একবার ত দেখা পাইয়াছি; প্রাণ কি শান্ত হইয়াছে, জ্বালা কি জুড়াইয়াছে? এ জ্বালা কি জুড়াইবার? যদি জুড়াইবার নহে, তবে এ আগুনে আপনি পুড়িয়া আবার সকলকে পোড়াই কেন? আমি পাপীয়সী কেন সকলের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম? কেন পত্নীর কর্ত্তব্য ভুলিলাম? কেন ধর্ম্মকর্ম্ম সকল ভুলিলাম? মা এই জন্যই কি অল্প বয়সে আমাকে সীতা, সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন? আমিই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

দুঃখের সময়, কষ্টের সময়, মানব স্বভাবতঃই আপনাকে ধিক্কার দেয়—সে আপনাকে সকল দোষের মূল বলিয়া মনে করে।

সুধাময়ী এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় সে শুনিল—কে বলিতেছে, "পোড়া কপাল আর কি!—গৃহস্থের ঘরের বৌ,—কলসী দড়ীও কি জুটে নাই?"

সুধাময়ী চমকিয়া উঠিল—এ কথা কে বলিল, কাহাকে বলিল? সুধাময়ী চারি দিকে চাহিল; কক্ষে আর কেহ নাই। সুধাময়ী উঠিয়া বাতায়নসম্মুখে গেল। গৃহের পশ্চাতে সেই পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে দুই

জন রৌপ্যালঙ্কারপরিহিতা রমণী বাসন মাজিতেছে, আর কোন অনুপস্থিতা প্রতিবেশিনীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়া তাহারই উদ্দেশে বলিতেছে—"পোড়া কপাল আর কি!—গৃহস্থের ঘরের বৌ—কলসী দড়ীও কি জুটে নাই!

সুধাময়ী ভাবিল, সত্য সত্যই কি আমার কলসী দড়ী জুটে নাই!

তখন অস্তমান রবি পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। সুধাময়ী শুনিল, নিম্নে রোয়াকে দাঁড়াইয়া শাশুড়ী ডাকিতেছেন, "একি ঘুম বাছা! গৃহস্থের ঘরে কি এমন চলে! তোমার বাপের বাড়ী নবাবের ঘর হয়, সেখানে নবাবী করিও,—এখানে ও সকল চলিবে না। বলি ও বৌ! আজ কি ঘাটে যাইবে না?"

সুধাময়ী তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। ঘড়া কাঁকে শাশুড়ী দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কেহ ত তোমার দাসী নহে বাছা, যে পাঁচ প্রহর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমাকে ডাকিবে।"

সুধাময়ী বাক্যব্যয় করিল না; তাড়াতাড়ি ঘরে যাইয়া গামছাখানা লইয়া আসিল। তখন শাশুড়ী বৌ ঘাটে চলিলেন।

* * * * * *

সেইদিন সন্ধ্যাকালে রন্ধনশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে

সুধাময়ী আপনার ঘরে যাইয়া একটা বাক্স খুলিল। বাক্স হইতে সে কতকগুলা কাগজ বাহির করিল। রন্ধনশালায় যাইয়া সুধাময়ী সেগুলাকে উনানে ফেলিয়া দিল। ধূধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—সুধাময়ী দাঁড়াইয়া দেখিল, কাগজগুলা প্রথমে একটু কোঁকড়াইয়া গেল, তাহার পর জ্বলিয়া উঠিল। এতদিন এই কাগজগুলা তাহার জীবনের একটা প্রধান সুখ ছিল, আজ সে স্বহস্তে সেগুলা পোড়াইয়া ফেলিল।

সুধাময়ীর নয়নে দুই ফোঁটা জল আসিল; অঞ্চলে সে চখের জল মুছিল। তাহার হৃদয় অশান্ত—উদ্বেলিত।

সেদিন রাত্রে অতুলচন্দ্রের শয়নকক্ষে আসিতে বিলম্ব হইল। একটা প্রজার জমা-বৃদ্ধি লইয়া সে ব্যস্ত ছিল। প্রথমে অতুলচন্দ্র তাহার উপর বিশ জুতার ব্যবস্থা করিয়াছিল। হুকুম তামিল হইল; হতভাগার পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া উঠিল; তথাপি সে জমায় বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করিল না। তাহার পর তাহাকে এক বেলা চূনের গুদামে রাখা হইয়াছিল; তাহাতেও সে জমায় বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হয় নাই। অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; আর স্থির হইল যে, বাকিকরের নালিশ করিয়া গোপনে ইস্তাহার জারি করিয়া জমা বিক্রয় করিয়া লওয়া হইবে।

অধঃপতন।

অতুলচন্দ্রের অধোগতি বড় দ্রুত হইতে লাগিল। ক্ষেত্র চাষ করা থাকিলে যেমন দুই এক পশলা বারি-পাতেই শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই দুই একটা ঘটনায় অতুলচন্দ্রের নিম্নগামী হৃদয়ে পাপ ও অত্যাচার-প্রবৃত্তি একবারে উদ্গত হইল। সে ভাবিল,—জগৎ আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে—আমি কেন তাহার প্রতিশোধ লইব না ?

সেদিন রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশিয়া অতুলচন্দ্র দেখিল, —উপাধানে মুখ লুকাইয়া সুধাময়ী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অতুলচন্দ্রের ওষ্ঠাধরে পৈশাচিক হাস্য দেখা দিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল,—"এই আমার প্রতি-হিংসার আরম্ভ।" সে একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। সে ভাবিল—এই প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

সে রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে কোন কথাই হইল না।

অতুলচন্দ্র ঘুমাইল, আর সুধাময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল,—আমি কেন মরি নাই! মুখ তুলিয়া সুধাময়ী দেখিল, অতুলচন্দ্র ঘুমাইতেছে। সুধাময়ী কিছু ক্ষণ স্বামীর সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল;—কত ক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহা সে বলিতে পারে না; তবে সে ভাবিল, যে, চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি হইবে না। সুধাময়ী ভাবিল—আজ যাহা ভাবিতেছি, কয় দিন পূর্ব্বে যদি তাহা

ভাবিতাম! আজ যে বাসনা নিবাইতে চাহিতেছি, যদি দুই দিন পূর্ব্বে তাহা নিবাইতে চাহিতাম! কেন তাহা করি নাই?

ভাবিতে ভাবিতে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

সুধাময়ী একবার মুখ নত করিল, আবার মুখ তুলিল; প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। বুঝি হৃদয় কম্পিত হইল,—বুঝি সে হৃদয়ে একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভূত করিল।

তাহার পর সে আবার কিছু ক্ষণ কি ভাবিল।

সুধাময়ী আবার মুখ নামাইল,—ধীরে ধীরে তাহার ওষ্ঠাধরে অতুলচন্দ্রের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল। সুধাময়ী মুখ তুলিল। তাহার পর শয্যায় শয়ন করিয়া সুধাময়ী কাঁদিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে যে যাতনা, তাহা কি ব্যক্ত করা যায়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদেশের পথে।

দুশ্চিন্তায় সেই ক্ষুদ্র কোটরে ভবেশের ভাল নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি জাগিলে যেমন হয়, তেমনই শেষ রাত্রে তাহার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সে নিদ্রাও দুঃস্বপ্ন-সঙ্কুল। প্রভাতে শিকল টানার হড়্ হড়্ শব্দে ও খালাসীদিগের গোলমালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

উঠিয়া মুখে ও চোখে জল দিয়া, ভবেশ বাহিরে আসিল। তাহার ইংরাজ সহযাত্রী তখনও শয্যার স্নেহালিঙ্গন-বদ্ধ। ভবেশ দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিল। চক্ষে আলোক-সম্পাতে সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায়, ইংরাজ পুরুষ, ভবেশকে শয়তানে লউক, আর একবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সবেগে দ্বার ঠেলিয়া দিলেন; বিকট শব্দে দ্বার রুদ্ধ হইল।

ভবেশ ডেকে আসিল। তখন জাহাজ তীর হইতে যাইতেছে; ক্যাপ্টেন দাঁড়াইয়া খালাসীদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, আর শিস্ দিতেছেন,—The girl I left behind। ক্যাপ্টেনের রৌদ্রদগ্ধ তাম্রবর্ণ, শ্রম-সহিষ্ণু, সুগঠিত দেহ, চড়া মেজাজ, ও বলিষ্ঠ গঠন—এ সকল দেখিয়া বোধ হয় না যে, প্রেম-নামক হৃদয়ঘটিত দ্রব্যটা তাঁহার নিকটে আসিতে পারে। যে চক্ষু কেবল আলোক-

স্তম্ভ কত দূর, তাহাই দেখিতে ভালবাসে, সে চক্ষু কি রমণীর প্রশংসা করিতে পারে? যে হৃদয় কেবল ঝটিকার সময় কেমন করিয়া জাহাজ রক্ষা করিবে, এই চিন্তাতেই পূর্ণ, সে হৃদয়ে কি প্রেম স্থান পায়? বুঝি ফেনিল-জলধি-বক্ষে সে হৃদয় শান্তি লাভ করে, আর উত্তুঙ্গ-তরঙ্গকুল-সঙ্কুল সাগরে বাত্যাতাড়িত তরণী রক্ষা করিয়াই সে হৃদয় সুখলাভ করে।

জাহাজ গঙ্গায় পড়িল; অনুকূল স্রোতোমুখে ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিল। কিছু দূর যাইয়াই বামে কেবল কারখানার চিম্‌নি, আর দক্ষিণে শ্যামশোভাময় বোট্যানিক্যাল গার্ডেন্‌স।

তাহার পর নদীর উভয় তীরের শোভা বড় মনোরম। জাহাজ চলিল—মরালী যেমন নদীর তরঙ্গে দেহ ভাসাইয়া, চরণে তরঙ্গ ঠেলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া যায়, জাহাজ তেমনই ভাসিয়া চলিল। কলিকাতা নগরী ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল; প্রথমে বোধ হইল, যেন সমস্ত সহর স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকাবরণে আচ্ছাদিত; তাহার পর গৃহাদি আর স্পষ্ট বুঝা যায় না; তাহার পর সকলই অস্পষ্ট।

ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, ভবেশ কলিকাতার দিকে চাহিয়াছিল। যখন সহরের শেষ-সীমা-রেখাও

অস্পষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহার হৃদয় হইতে একটি বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া প্রভাতপবনে মিশাইয়া গেল; তাহার নয়ন হইতে দুই ফোঁটা জল পড়িয়া ভাগীরথীর জলরাশির মধ্যে বিলীন হইল।

বিদেশ গমনোন্মুখ কত হতভাগ্যের অশ্রু ভাগীরথীর পুণ্যনীরে নিপতিত হইয়াছে! জন্মস্থান, পরিজনবর্গ ছাড়িয়া যত দূরে যাওয়া যায়, হৃদয় ততই তাহাদিগের নিকটে যাইতে চাহে। নিকটে থাকিতে যাহাদিগের দিকে চাহ নাই, দূরে যাইলে তাহাদিগকেও দেখিতে ইচ্ছা করে। বুঝি দূরত্বের ব্যবধানই তাহাদিগকে মধুর করিয়া তোলে।

ভবেশ ধীরে ধীরে আপনার ক্যাবিনে গেল। তখন তাহার ইংরাজ সহযাত্রী উঠিয়া হাই তুলিতে তুলিতে শার্টের উপর ওয়েষ্টকোট চড়াইতেছেন।

গঙ্গা ছাড়াইয়া জাহাজ বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িল। সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবা। সম্মুখে চক্রবালাবধি প্রসারিত নীল জলরাশি; পশ্চাতে জলবেণীরম্যা ভাগীরথী। ভাগীরথীর তীরে দূরে বনশ্রেণী গগনের নীলিমায় মিশাইয়া গিয়াছে। সম্মুখে জলধি স্থির; সূর্য্যালোক সাগর-সলিলে নিপতিত হইয়াছে। সলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে—ছল্ ছল্ করিয়া জাহাজের অঙ্গে আঘাত করিতেছে।

ক্যাপ্টেন একটা কি আদেশ দিলেন; খালাসীরা ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল, কেহ কেহ দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিল।

তাহার পর জাহাজ আর একটু অগ্রসর হইলে চারি দিকেই কেবল নীল বারিবিস্তার; সেই বিশাল বারিধি-বক্ষে জাহাজ ক্ষুদ্র জলবিম্বের মত বোধ হইতে লাগিল। তরঙ্গে জাহাজ হেলিতে দুলিতে লাগিল। জাহাজের যাত্রী-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বমন করিতে আরম্ভ করিল। ভবেশ নিষিদ্ধ মাংসে উদর পূর্ণ করিয়াছিল—তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার দেহমধ্যে সেই খাদ্যে ও তাহার পাকযন্ত্রে বিষম সংগ্রাম চলিতেছে।

ভবেশ কোনরূপে ডেকে আসিল; ডেকে আসিয়া পকেট হইতে সুধাময়ীর পত্রগুলা বাহির করিয়া, বারিধি-বক্ষে বিসর্জ্জন করিল। তাহার পর সে একখানা চেয়ার লইয়া ডেকে বসিল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, আর নিম্নে অনন্ত নীল সমুদ্র;—দূরে নীল আকাশ আর নীল সাগর মিশাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। সূর্য্যকরে নীল জলরাশি জ্বলিতেছে—চারি দিকে যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবল নীল জলের খেলা। কিন্তু ভবেশের এ শোভা উপভোগ করিবার অবকাশ ছিল না—সে চিন্তামগ্ন। চেয়ারে বসিয়া ভবেশ ভাবিতেছিল, আর ডেকের অপর

পার্শ্বে একখানা ডেক-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ক্যাপ্টেন শিস্ দিতেছিলেন,—The girl I left behind.

ভবেশ ভাবিতে লাগিল, কুক্ষণে আমি সুধাময়ীকে দেখিয়াছিলাম। সে দিন নয়ন তাহার নয়নে কি মোহ দেখিয়াছিল!—দোষ আমার। আমি কেন সেই বালিকা-হৃদয়ে প্রেম জাগাইয়াছিলাম; কেন ভবিষ্যতের দিকে চাহি নাই!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। দুই ফোঁটা অশ্রু ডেকের উপর পড়িল; তাহার পর আরও দুই ফোঁটা পড়িল। এই সময় এক জন খালাসী আসিয়া বলিল, "বাবু, বাতাস উঠিতেছে; ঘরে যান।"

তখন একটু বাতাস উঠিয়াছে। সাগরে তরঙ্গ উঠিয়াছে, আর সেই তরঙ্গে জাহাজ বড় দুলিতেছে। দুই একটা শ্বেতফেনচূড় তরঙ্গ জাহাজের উপর উঠিতেছে। খালাসীরা চারি দিকে পর্দ্দা টানিয়া দিতেছে। ক্যাপ্টেনের সহকারী চক্ষে দূরবীক্ষণ কসিয়া সম্মুখে সমুদ্রের অবস্থা দেখিতেছেন। এক দল জলচর বিহঙ্গ জাহাজের নিকটে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ভবেশ ক্যাবিনে গেল; শুনিতে শুনিতে গেল—সেই তরঙ্গ-কল্লোলের মধ্যে শুনা

যাইতেছে—ক্যাপ্টেন শিস্ দিতেছেন, The girl I left behind.

ভবেশ ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইল। তাহাকে চক্ষের জল মুছিতে দেখিয়া, তাহার ইংরাজ সহ-যাত্রী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ইহারা কি স্ত্রী-প্রকৃতির!" তাহার পর প্রভু একটা চুরট ধরাইয়া, ধূমে সেই ক্ষুদ্র ক্যাবিন পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ভবেশ ভাবিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুই দিক।

যত দিন যাইতে লাগিল, সুধাময়ীর হৃদয়ে ততই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কথায় বলে, "চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।" বাস্তবিক আন্তরিক চেষ্টায় অনেক কার্য্য হইতে পারে। হৃদয়ের বেদনা একেবারে দূর না হউক, উপশমিত হইতে পারে; ক্ষত পূর্ণ হইয়া যায়—কেবল একটু চিহ্ন থাকে।

দারুণ মর্ম্মব্যথা সুধাময়ীর আপনার প্রতি ঘৃণা যত প্রবল হইতে লাগিল, অতুলচন্দ্রের প্রতি তাহার ততই আকর্ষণ জন্মিতে লাগিল। হয় ত তাহার আর একটা কারণ ছিল। অভ্যাস ক্রমে হৃদয়ে জড়াইয়া যায়। যে খাদ্যের প্রতি প্রথমে এক জনের বিতৃষ্ণা থাকে, অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে তাহার নিকট সেই খাদ্য উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। নহিলে মদ্যপের নিকট তীব্র-স্বাদ মদ্য উপাদেয় বোধ হইত না; নহিলে গলিত মৎস্যের জন্য মগ পাগল হইত না। সুধাময়ী এতদিন ধরিয়া অতুলচন্দ্রের সহিত যে প্রেমাভিনয় করিয়াছিল, হয় ত ক্রমে ক্রমে তাহা তাহার হৃদয়ে জড়াইয়া যাইতেছিল; এখন সহসা এই অপ্রত্যাশিত বিপ্লবে সেই ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাব একেবারে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অধঃপতন।

সুধাময়ী ভাবিল, হায়! সুখ-দিন একবার বহিয়া গেলে কি আর ফিরিয়া আইসে না! জীবনের সুখ, আশা যদি একবার নষ্ট হয়, তবে কি জীবনে আর সুখলাভ হয় না! যদি না হয়, তবে আর এ দুঃখময় জীবনের বোঝা বহিয়া মরি কেন?

সুধাময়ী বুঝিল, এ জীবনে অতুলচন্দ্র তাহার অপরাধ ভুলিতে পারিবে না; কিন্তু সে কি তাহার এতটুকু স্নেহও পাইবে না? যদি না পায়, তবে আর কি আশায় সে এ পাপময় জীবন রাখিবে? সুধাময়ী ভাবিল, যে জীবনে তাহার আকর্ষণ নাই, সে জীবনে তাহার মমতা কি?

আশাহীন হইয়া কেহ জীবনধারণ করিতে পারে না। সুধাময়ীরও কোন আশা ছিল, নহিলে সে জীবন রাখিতে পারিত না। সে আশা কি?

* * * * *

সুধাময়ীরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, অতুলচন্দ্রেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সুধাময়ীর পরিবর্ত্তন যদি উন্নতির দিকে বলিতে হয়, তবে বলিতে হয়, অতুলচন্দ্রের পরিবর্ত্তন অধঃপতনের দিকে।

সুধাময়ীর পরিবর্ত্তিত ব্যবহারে সে একবারও বুঝিতে চাহিল না যে, সত্য সত্যই হয় ত সে পূর্ব্বকৃত কার্য্যের

জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে। সুধাময়ীর ব্যবহারে রস-সাগরের সেই রসময় কবিতাটি তাহার মনে পড়িত—

"প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর।
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর॥
শাল পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর।
পাথারে পড়িলে তরী বদর বদর॥"

সে ভাবিত, এখন "শাল পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর।"

সুধাময়ী দেখিতে লাগিল, অতুলচন্দ্র দিন দিন অধিক ক্রোধপরবশ হইয়া উঠিতেছে। সুধাময়ী প্রায়ই দেখিতে পাইত, অত্যাচারী অতুলচন্দ্রের দারুণ অত্যাচারে নিরন্ন প্রজার পত্নী সন্তানের মুখে অন্নগ্রাস দিতে না পারিয়া, তাহাকে একটু বলিয়া দিবার জন্য তাহার মাতার নিকট আসিয়া কাঁদিত। যে সেই মুখরা, গর্ব্বিতা গৃহিণীর অধিক তোষামোদ করিতে পারিত, তিনি তাহার পক্ষ হইয়া, ছেলেকে দুই একটা কথা বলিতেন; কিন্তু অতুলচন্দ্রের নিকট প্রায় সকল অনুরোধই ব্যর্থ হইত। যাহাতে লাভ আছে, তাহা করিতে অতুলচন্দ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না; তাহার ন্যায়ান্যায়বিচারও সে করিত না।

অত্যাচার-পীড়িতাদিগের অশ্রু দেখিয়া সুধাময়ী অশ্রু-বর্ষণ করিত।

অধঃপতন।

যদি কোন প্রজার পত্নী দুর্ভাগ্যক্রমে "বাবু"কে একটু দয়া করিতে বলিবার জন্য সুধাময়ীর নিকটে আসিত, তবে আর রক্ষা থাকিত না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী কেবল যে তাহাকেই গৃহ হইতে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেন, এমন নহে; সঙ্গে সঙ্গে বধূকেও যথেষ্ট তিরস্কার হইত। সুধাময়ী কিছু বলিত না, কেবল কাঁদিত।

ক্রন্দন ভিন্ন তাহার আর উপায় কি? যে রমণী স্বামীর ভালবাসা হারাইয়াছে, তাহার ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় কি? পতির প্রেমে রমণী-হৃদয়ে দ্বিগুণ বল সঞ্চারিত হয়; পতির প্রেম দুর্ভেদ্য বর্ম্মরূপে রমণীকে রক্ষা করে। যে রমণী নিজদোষে তাহা হারায়, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কাহার—ক্রন্দন ভিন্ন তাহার আর কি আছে?

সুধাময়ী কাঁদিত, আর দেখিত, তাহার প্রতি তাহার স্বামীর ঘৃণা দিন দিন যেন বর্দ্ধিত হইতেছে। সে লক্ষ্য করিত, অতুলচন্দ্র ক্রমে পূর্ব্বের সকল সদভ্যাস পরিহার করিতেছে।

অতুলচন্দ্রও ভাবিত—সুখের দিন একবার চলিয়া গেলে কি আর ফিরিয়া আইসে না?

বাল্যের সেই ধর্ম্মভীতি, যৌবনের সেই অতৃপ্ত উন্নতি-পিপাসা, সেই জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, সেই সমাজ-সংস্কারবাসনা, অতুলচন্দ্র এখন সে সকলই ভুলিয়াছে। সেই সভা করিয়া,

ঈশ্বরারাধনায় আত্মোন্নতি-বিধান-চেষ্টা, সেই ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় বৃহৎ বৃহৎ প্রবন্ধপাঠ, অতুলচন্দ্র এখন সে সকলই ভুলিয়া যাইতেছে;—এখন তাহার মনে হইতেছে,—সে সবই ছেলেমী, সে সবই যৌবনের খেয়ালমাত্র!

অস্তগমনোন্মুখ তারকার মত জ্ঞানের পশ্চাতে ধাবিত হইবার সেই প্রবল বাসনা, তাহার স্থানে এখন প্রবল ধনতৃষ্ণা বিরাজ করিতেছে। করুণা এখন নির্ম্মমতাকে স্থান দিয়াছে; বিনয় এখন ক্রোধের নিকট বিদূরিত। ক্রোধোন্মত্তের তীব্র কদর্য্য গালি এখন অশ্রুর স্থান লইয়াছে। অতুলচন্দ্র এখন আপনাকে আপনি বুঝায় যে, বিনয় কাপুরুষোচিত বৃত্তি; অশ্রু দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

সেই অতীত জীবনের কথা এখন অস্পষ্ট স্বপ্নের মত এক একবার মনে হয়; কিন্তু অতুলচন্দ্রের অন্য চিন্তা আছে; সে সকল চিন্তা তাহার মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। মানব যখন হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সকল হারায়, তখন কোন দুষ্কর্ম্মের জন্যই আত্ম-সমর্থন করা আর তাহার নিকট কঠিন হয় না। অত্যাচারীর এক কথা ত আছেই—আবশ্যক। বাস্তবিক স্বার্থের জন্য মানব না করিতে পারে, এমন কার্য্য নাই। কথিত আছে,—কোন ঋষি এক শত গাভীর বিনিময়ে, বলিদানজন্য আপনার পুত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন; আর এক শত গাভী লইয়া,

তিনি সেই আত্মজকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়াছিলেন; এবং আরও এক শত গাভী পাইয়া, সেই সন্তানকে হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন! এখনও দেখা যায়, করুণাবতার খৃষ্টের উপাসকগণ কেবল স্বার্থের অনুরোধেই বিষতুল্য অপকারী মদ্য ও অহিফেনের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন; এবং কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ নৃপতি পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালনীয় প্রজার মঙ্গল-কামনায় তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টিত হইলে, সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, নররক্ত-কলুষিতকরে সেই ব্যবসা করিয়া থাকেন।

নিবৃত্তি জীবনের উদ্দেশ্য হইলে, জগতে মানবের উন্নতি হইতে পারে কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে; তবে নিবৃত্তির স্থলে প্রবৃত্তি জীবনের উদ্দেশ্য হইলে মানবের পক্ষে জাগতিক মঙ্গল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ অল্প। ধ্যান-যোগীর পক্ষে নিবৃত্তি শ্রেয়ঃ হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মযোগীর পক্ষে প্রবৃত্তিই শ্রেয়ঃ। তবে প্রবৃত্তিও সুফলের মত কুফল প্রসব করিতে পারে। সে ফল মানবের বিচারের উপর নির্ভর করে।

অতুলচন্দ্র আর একটা লাভজনক ব্যবসায় আরম্ভ করিল, সেটা ধান্যের দাদন। কথাটা একটু বিশদরূপে বুঝাইবার আবশ্যক হইবে। আজ কাল এ দেশে কৃষকের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে,

তাহাকে অন্নের জন্য প্রায়ই মহাজনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মহাজন 'দেড়া পালি' পর্য্যন্ত হিসাবে তাহাকে ধান্য দিয়া থাকে; অর্থাৎ, কৃষক যে পরিমাণ ধান্য ধার করে, পরফসলের সময় তাহাকে তাহার দেড় গুণ ধান্য মহাজনকে দিতে হয়। টাকার হিসাবে ধরিতে গেলে, ইহা শতকরা বার্ষিক শত টাকা সুদে টাকা ধার দেওয়া। কৃষক ছয় মাস ধান্য রাখে, তাহাতেই তাহাকে দেড় গুণ দিতে হয়, অর্থাৎ এক শত টাকার স্থানে এক শত পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়। পল্লীগ্রামে এরূপ মহাজনের অভাব নাই। এ কথা ভাবিলে, আর বোধ হয় না যে, সেক্সপিয়ারের "সাইলক"-চরিত্র অতিরঞ্জিত। ইহার উপর আবার সুদের সুদ চলে; তাহাই রীতি। ইহাতে মহাজনের গোলা শীঘ্রই ধান্যপূর্ণ হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রজার হা'ল, গরু বজায় রাখাও ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় সভ্য দেশসমূহে যেরূপ Agricultural Bank আছে, এ দেশে গভর্মেণ্ট বা জমীদারগণ সেইরূপ Bank স্থাপন করিলে প্রজার অনেকটা উপকার হয়। কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা বার্ষিক তিন টাকা বা সাড়ে তিন টাকা; যদি সরঞ্জামী খরচ ধরিয়া প্রজার কাছে শতকরা বার্ষিক দশ টাকা সুদও লওয়া হয়, তাহা হইলে ঋণদাতারও

লাভ হয়, অৰ্দ্ধাশন-পীড়িত প্রজারও যথেষ্ট উপকার হয়।

অতুলচন্দ্র এই ব্যবসায় আরম্ভ করিল।

আপনার অত্যাচারের সমর্থন তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। অতুলচন্দ্র অদৃষ্টবাদ অবলম্বন করিল। সে বলিত,—আমি কে? আমি কি? আমি কি কোন কার্য্য করিবার কর্ত্তা? ভগবান আমাকে দিয়া যাহা করান, আমি তাহাই করি মাত্র—তিনিই কর্ত্তা। আমি তাঁহার হস্তে অস্ত্রমাত্র। নিজের সকল কার্য্য সম্বন্ধেই সে বলিত,—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

শ্রাবণের শেষ; কয় দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ প্রভাত হইতে বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে; এখনও আকাশে দুই চার-খানা মেঘ দেখা যাইতেছে। বর্ষাবারিপাতে কূলপ্লাবিনী নদীর তীরস্থ প্রান্তরে একখানা বাঙ্গ্‌লো; বাঙ্গ্‌লোর বারান্দায় একখানা আরাম-কেদারায় ভবেশ শয়ন করিয়া আছে। সম্মুখে প্রাঙ্গনের পরেই কূলপ্লাবিনী তরঙ্গিণী তরঙ্গ-ভঙ্গে বহিয়া যাইতেছে; দুই পার্শ্বে সুদূরপ্রসারিত বৃক্ষলতা-সুশোভিত প্রান্তর, তাহার পর ছায়া-সুশীতল গ্রামগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীড়ের মত দেখাইতেছে। একটা বাঁধের তদারকে এঞ্জিনিয়ার আসিবেন, তাই ভবেশকে পূর্ব্বেই আসিতে হইয়াছে। ভবেশ আজ দুই দিন এখানে আসি-য়াছে। বোধ করি, এই দুর্য্যোগে এঞ্জিনিয়ার এখনও পঁহুছিতে পারেন নাই।

এই প্রান্তরমধ্যে নিঃসঙ্গ বাঙ্গ্‌লোতে ভবেশ, এঞ্জি-নিয়ারের এক জন চাপরাশী ও ভবেশের একটিমাত্র ভৃত্য বাস করে। ভৃত্যটি বাঙ্গালী; কোন বাঙ্গালীর সহিত উড়িষ্যায় আসিয়াছিল; এখন ভবেশের চাকরী করিতেছে। উড়িয়া ভৃত্যগণ দিবাভাগে বাঙ্গ্‌লোতে থাকে; কেবল মধ্যাহ্নে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যাইয়া আহারাদি করিয়া আইসে।

রাত্রিকালে তাহারা বাঙ্গ্‌লোয় থাকিতে চাহে না, কারণ নিকটস্থ সকল পল্লীতে প্রকাশ যে, ইতিপূর্ব্বে এক জন 'সাহেব' এই বাঙ্গ্‌লোয় আত্মহত্যা করিয়াছিল,—তাহার প্রেতাত্মা আজও সেখানে বাস করে। এক দিন গভীর রাত্রে কোন কৃষক গৃহে যাইতে তাহাকে বারান্দায় বেড়াইতে দেখিয়াছিল; আর এখনও নাকি মধ্যে মধ্যে প্রান্তর-মধ্যে তাহার আর্ত্ত চীৎকার-রব নৈশগগনের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে।

এখানে ভবেশের কোন কার্য্য নাই, তাই দুশ্চিন্তার অভাব নাই। কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে মনে দুশ্চিন্তার অবসর থাকে না। এখানে এ কয় দিন একে ত কোন কার্য্য নাই, তাহাতে আবার বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হওয়া যায় না; কাজেই এ কয় দিন ভবেশ কেবল চিন্তার আশ্রয় লইয়াছে। আজ মেঘমালাবৃত ম্লান-তেজ-রবিকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে অলস-ভাবে আরাম-কেদারায় বসিয়া ভবেশ ভাবিতেছে। সম্মুখে জলবেণীরম্যা তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে। সে সেই দিকে চাহিয়া আছে সত্য, কিন্তু কিছু দেখিতেছে কি না সন্দেহ।

চাকরদিগের কক্ষে ভবেশের ভৃত্য খাটিয়ায় শয়ন করিয়া মৃদু মৃদু গাহিতেছিল—

"চলগো, করিব মোরা শ্যামদরশন;
সে ধনে হেরিলে হবে বাঞ্ছাপূরণ।

সে যে রাজা হয়ে বসেছে মথুরাধামে,
কুব্জাধনী রাণী হয়ে বসেছে বামে—"

গত জীবনের স্মৃতি ভবেশের হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল। ভবেশ ভাবিতেছিল—দেশ ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া, এই দূরদেশে আপনার কার্য্যে আপনাকে মগ্ন করিয়া, সব ভুলিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ভুলিতে পারিলাম কই? —হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল কই? সে স্মৃতি কি মুছিবার— সে কথা কি ভুলিবার? যদি ভুলিতেই না পারিলাম, তবে আর এ জ্বালা লইয়া বাঁচিয়া থাকি কেন? ঐ খরস্রোতা নদীর জলে এ জ্বালা জুড়াইলে ত পারি!

ভবেশ একবার সম্মুখে চাহিল—চল চল্ ছল ছল্ করিয়া নদী বহিতেছে; তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে। ভবেশের বোধ হইল, যেন নদী তরঙ্গ-বাহু তুলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে। সহসা নদীতীর হইতে উচ্ছ্বসিত কলহাস্য শ্রুত হইল। ভবেশ চাহিয়া দেখিল,—যেখানে একটা কেতকী-কুঞ্জের মূল পর্য্যন্ত জল আসিয়াছে, সেই স্থানে কয় জন উৎকল-রমণী মৃৎকলস লইয়া জলসংগ্রহ করিতে সমবেত হইয়াছে। তাহারা কি গল্প করিতেছে, আর তাহা-দিগের কলহাস্য সেই কেতকীরেণুসমাকীর্ণ পবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ভবেশ ভাবিল,—এ জ্বালা যদি এমনই না জুড়ায়, তবে

পাপের হীন উত্তেজনায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া জ্বালা প্রশমিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ খরবাহিনী-নিম্নগানীরে এ হৃদয় জুড়ানই ভাল। তাহাতে ক্ষতি কি?

তাহার পর ভবেশ ভাবিল,—আমার জীবনের জ্বালা জুড়াইল না; সুধাময়ীর জ্বালা জুড়াইয়াছে কি? পতির পবিত্র প্রেমে তাহার হৃদয়ের ক্ষত শুকাইয়াছে কি? সে কি এত দিনে অতীতকথা ভুলিতে পারিয়াছে?—ভুলিতে পারিলেই মঙ্গল।

উঠিয়া ভবেশ বারান্দায় পদচারণ করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার সঙ্গীতপ্রিয় ভৃত্য গাহিতেছিল,—

"ভোলা যায় কি কথার কথা, প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা!
শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িতা লতা?
হ'লে পরে বারিহীন, থাকিতে কি পারে মীন?
ছেড়ে কভু নব ঘন রহে কি বিজলী লতা?"

ভবেশ ভাবিল—সত্যই ভুলিয়া যাওয়া কি কথার কথা! —তাহা হইলে আজ আর জীবনে এ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।

ভবেশ ভাবিতে লাগিল—সুধাময়ী আমাকে ভুলিতে পারিয়াছে কি? হয় ত সেও আমারই মত জীবনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; হয় ত সে এখন কীটদষ্ট কুসুমের মত শুকাইতেছে। সুধাময়ী আমাকে বলিয়াছিল,—"আমি

কেন হৃদয়ে এক জনের হইয়া আর এক জনের হইলাম?” সত্যই দোষ কাহার?

সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে দুই জনের সেই সাক্ষাতের কথা ভবেশের মনে পড়িল। সুধাময়ীর সেই অশ্রুপূর্ণ নয়ন তাহার স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল। ভবেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভবেশ আবার সম্মুখে কলবাহিনী নদীর দিকে চাহিল। নদী তেমনই কলহাস্যে বহিয়া যাইতেছে; আর দুই জন উৎকল-রমণী পূর্ণকুম্ভ লইয়া, জলভরা বর্ষার মেঘের মত ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে যাইতেছে; তাহাদিগের সুগঠিত দেহে যৌবন তাহার শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ভবেশ ভাবিল,—আর কি আশায় এ জীবন রাখি? আমার আর কি সুখের আশা, শান্তির আশা আছে! তবে কেন জ্বালা জুড়াই না!

তাহার পর ভবেশ ভাবিল—মরিব কেন? বালিকা-হৃদয়ে প্রেম জাগাইয়া, তাহাকে এত আশা দিয়া নিতান্ত নির্ম্মমের মত চলিয়া আসিতে পারিয়াছি; তাহার হৃদয়ে জীবনব্যাপিনী জ্বালা জ্বালাইয়াছি; আর আপনি এতটুকু সহ্য করিতে পারিব না! জীবনে এই যাতনা-ভোগই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি এ জীবন রাখিব। আত্মগ্লানি ত আমার কর্ম্মের ফল—তাহার জন্য আজ এত কাতর কেন! দোষ আমার—দোষ আর কাহারও নহে।

ভবেশ এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় ধূসর মেঘমালা আবার আকাশ ছাইয়া ফেলিল; প্রান্তরের দূরপ্রান্তে তরুরাজির শিরে যেন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। বোধ হইতে লাগিল, নদীর অপর কূলে নদীনীর ও নীরদ মিশিয়া গিয়াছে। তাহার পর বারিপাত আরব্ধ হইল। বর্ষা-বারিপাতে নবোদ্গত তৃণদলে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; নদীর জল চঞ্চল হইয়া উঠিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দুর আঘাতে তরঙ্গরাশির উপর যেন ক্ষুদ্রতর তরঙ্গরাশি উঠিতে লাগিল। নদীতীরে একটা বৃক্ষে বায়সকুল কলরব করিয়া উঠিল। ভবেশের মনে হইল, চিন্তাহীন শৈশবে এমনই দুর্দ্দিনে ভাই-ভগিনী একত্র হইয়া ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনিত। বাহিরে মেঘ গর্জ্জন করিত, বিদ্যুৎ চমকাইত, আর সেই কম্পিত-হৃদয় শিশুরা পিতামহীর আরও নিকটে যাইয়া বসিত। হায় সেই শৈশব! তখন কে জানিত, জীবন কেবল যাতনা; কে জানিত, জীবন দুর্ব্বহ ভারমাত্র?

ভবেশ এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় অদূরে অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত শব্দে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ভবেশ চাহিয়া দেখিল, সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেগে অশ্ব চালাইয়া, এঞ্জিনিয়ার বাঙ্গ্‌লোর দিকে আসিতেছেন। মস্তকে টুপি নাই; বোধ হয়, বায়ুবেগে সেই ক্ষুদ্র ধামাটা উড়িয়া পথে কোথাও পড়িয়া গিয়াছে; তিনি আর এ ঝড় বৃষ্টিতে

নামিয়া তাহা তুলেন নাই। আরোহী ও অশ্ব উভয়েরই আপাদমস্তক জলসিক্ত; উভয়েরই অঙ্গে জলধারা বহিতেছে। গ্রীবা বাঁকাইয়া অশ্ব বেগে ছুটিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে নাসিকায় একপ্রকার অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে।

এঞ্জিনিয়ার লাফাইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন; একটা খুঁটিতে অশ্বের লাগাম বাঁধিয়া ভবেশকে বলিলেন,—"বাবু, কি দুর্য্যোগ!"

ভবেশ অভিবাদন করিয়া বলিল, "এ দুর্য্যোগে আসিলেন কেন?"

"আমি যখন বাহির হই, তখন আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, বাহির না হইলেই করিতাম ভাল।"

"পোষাক পরিবর্ত্তন করুন। একেবারে ভিজিয়া গিয়াছেন।"

"ধন্যবাদ।—আমার চাবি? ওঃ এই যে। এ দুই দিন আপনি একা খুব কষ্ট পাইয়াছেন?"

"এমন বিশেষ কষ্ট কিছুই নহে।"

স্কচ এঞ্জিনিয়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্কচ বেশপরিবর্ত্তনের পর বাহিরে আসিয়া, চাপরাশীকে বলিলেন,—"বাবুকো ওয়াস্তে একঠো চৌকি লাও।"

চাপরাশী চৌকি আনিয়া দিল; ভবেশ বসিল।

তাহার পর হুকুমমত চাপরাশী হুইস্কি আনিল—পেগ পান করিয়া, সাহেব গাহিতে লাগিল,—

"Had I a cave on some wild distant shore,
Where the winds howl to the waves' dashing roar,
There would I weep my woes,
There seek my lost repose,
Till grief my eyes should close
Ne'er to wake more."

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্যাকুলতা।

পিত্রালয়ে শয়নকক্ষে সুধাময়ী একাকিনী ভাবিতেছে। গভীর রাত্রি। বাহিরে বারিপাত-শব্দ শ্রুত হইতেছে; আকাশে তারকারাজি নির্ব্বাপিত, একখানি বস্ত্রের মত বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। সন্ধ্যা হইতে বৃষ্টির বিরাম নাই। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে,—রাস্তার পার্শ্বে পাকা নর্দ্দামা ছাপাইয়া, জল সুধাময়ীর পিত্রালয়ের পশ্চাতে সেই পানা পুকুরে পড়িতেছে—সে শব্দ শুনা যাইতেছে; পানা-পুকুরটা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কূলে কূলে কুনো, কোলা প্রভৃতি নানাজাতীয় ভেককুল আনন্দ-কোলাহলে সে স্থান শব্দমুখর করিয়া তুলিতেছে। অদূরে কোন গৃহে এক জন এমনই ঘনঘোর বর্ষায় বিরহিণীর বিরহ-বেদনা-ব্যঞ্জক গীত গাহিতেছে,—

"ঘনঘটা ঘেরি আই কারি কারি—
সোই পিয়া বিনু মেরি নিদ না আওয়ে,
আঁধিয়ারি সো সারি মারি—
ঘনঘটা—
দামিনী দমক চমক ডর লাগে।—
চমকি চমকি চিত উঠত শেজ পর
ঘনঘরাতি মন নারি নারি।"

অধঃপতন।

জানি না, মেঘের সহিত মানবমনের কি সম্বন্ধ আছে; তাই বর্ষার ঘনঘটায় মানবের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। বর্ষায় মানবের এই চিত্তচাঞ্চল্যের কথায় কবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।"

যখন মেঘমালা গগন ছাইয়া ফেলে, যখন বিরহিণীর অশ্রুধারার মত অবিরল বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তখন জানি না, কেন মানবের মন চঞ্চল হইয়া উঠে। কি অস্ফুট আকুলতা, কি অজানা আশঙ্কা, কি অব্যক্ত ব্যাকুলতা হৃদয় চঞ্চল করিয়া তুলে! রামগিরির শিখরে আষাঢ়ের প্রথম-মেঘদর্শনে বিরহী যক্ষের সেই ব্যাকুলতা, মানব-হৃদয়ের ব্যাকুলতার চিত্রমাত্র; সে অমানুষী কিছুই নহে। তাই বলিতেছি, জানি না, মেঘের সহিত মানব-মনের কি সম্বন্ধ আছে যে, বর্ষায় মানবের চিত্ত কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে।

আজ এই নিশীথে সুধাময়ী ভাবিতেছে, যাহা খুঁজিলাম, তাহা পাইলাম কই? জীবনের কোন্ আশা মিটিল? প্রথম জীবনে যে অবলম্বন লইব ভাবিয়াছিলাম, তাহা ত লইতে পারিলাম না; তাহার পর আবার নিজকর্ম্মদোষে জীবনের অবলম্বন, সংসারের স্বর্গ স্বামীর প্রেমও হারাইলাম। হায়! মানব-জীবন, তুই কি কেবল দুঃখময়, কেবল

যাতনা-ভরা! মানবের অদৃষ্ট কি মানবের বিমাতা যে, মানবের উপর তাহার দয়া নাই! সে কেবল যাতনা পায়, কেবল তিরস্কৃত হয়! আমি ত এত দিন কেবল আশা করিয়াছি যে, উষার অব্যবহিত পূর্ব্বে যেমন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আইসে, তেমনই দূর হইবার পূর্ব্বে আমার দুঃখ দুর্দ্দশা গাঢ়তম হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু দুঃখ-রজনী পোহাইল কই? এই সুখের ছলনা লইয়াই কি জীবন কাটাইতে হইবে? আমি যত অগ্রসর হই, জীবনের সুখও যে ততই দূরে যায়! অতীত-কথা আজ স্বপ্ন! আমি ত সে বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি, তবুও কি কেবল যাতনা লইয়া জীবন কাটাইতে হইবে!

তাহার পর সুধাময়ী ভাবিল, সবই আমার কর্ম্মদোষে ঘটিয়াছে। আমি কি পাই নাই? এ জগতে স্বামীর প্রেমই রমণীর চিরবাঞ্ছিত, আমার কি সে প্রেমের অভাব ছিল! আজ যে আমি পতির পদসেবাও করিতে পাই না, সে দোষ কাহার?

বিবাহের পর অতুলচন্দ্রের সেই ভালবাসা, সেই আদরের কথা, সেই সব তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যে সরসী-সলিলে আমরা আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি নিমগ্ন রাখি, তাহার জলরাশি বড় অল্প আন্দোলনেই আবিল হইয়া উঠে। তাই অল্প আন্দোলনেই আজ সুধাময়ীর হৃদয়

দুশ্চিন্তায় আবিল হইয়া উঠিল,—অতীত-কথা আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। অতুলচন্দ্রের প্রত্যেক প্রেমসম্ভাষণ, প্রত্যেক আদর ও সোহাগ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর ইহার পূর্ব্ববার পিত্রালয়ে আগমনকালে অতুল-চন্দ্রের সেই শেষ চুম্বন—সে দিন সে তাহা ঘৃণা করিয়াছিল;—কিন্তু আজ তাহার স্মৃতিও তাহার নিকট স্বর্গ-সুখ। সে হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে সে স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়াছে; তবুও পল্লবান্তরালস্থিত কুসুমের সৌরভ যেমন বনভূমি আমোদিত করিয়া রাখে, তেমনই সেই স্মৃতি তাহার আঁধার হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। হায়, এ জীবনে কি আর সে তাহা পাইবে না!

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল,—বালিকাবয়সে গঙ্গামৃত্তি-কায় শিব গঠন করিয়া, পূজান্তে সেই মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিতাম, যেন স্বামি-সম্পদে উমার মত সৌভাগ্যশালিনী হই। দেবতা আমার প্রার্থনা সফল করিয়াছিলেন—আমি আমার সর্ব্বস্ব সাগরে বিসর্জ্জন দিয়াছি—আজ আর কাহাকে দোষ দিব? আমি ত দেব-তুল্য স্বামীই পাইয়াছিলাম; তখন কেন তাঁহার পদতলে এ প্রাণ অর্পণ করি নাই? আজ আমি কাহার দোষ দিব?—আর সেই দেবতুল্য স্বামী—আমারই ব্যবহারে তিনি আজ বিপথগামী! আমার স্থান কোন্ নরকে!

এখন অতুলচন্দ্রের সবই সুধাময়ীর নিকট ভাল লাগে। জগতে কে ইহা লক্ষ্য করে নাই? যাহাকে ভালবাসি, কেবল সে ভালবাসে বলিয়াই কত অপ্রিয় বস্তুও ভালবাসিতে আরম্ভ করি। এক জনের করস্পর্শে কত অপবিত্র দ্রব্য পবিত্র বলিয়া বোধ হয়; কত ঘৃণিত পদার্থও প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। ভালবাসার প্রভাবে অতীত জীবনে আর বর্ত্তমান জীবনে কি পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হয়! প্রেমের প্রভাব আশ্চর্য্য! প্রেমের শক্তির সীমা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুধাময়ীর নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে; ইহা কি আদ্যন্ত বিষাদময় হইবে?

সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীতে একাকিনী বসিয়া সুধাময়ী কি দুশ্চিন্তাই ভোগ করিতে লাগিল! মাসাধিক কাল সে পিত্রালয়ে আসিয়াছে, অতুলচন্দ্র ইহার মধ্যে একবার তাহার সংবাদ লওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই। আজ সুধাময়ী ভাবিতেছে যে, স্বামীর নিকটে থাকিয়া তাঁহার উপেক্ষা ও তিরস্কার এবং শাশুড়ীর কারণে অকারণে গালাগালি সহ্য করা স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকা অপেক্ষা ভাল। কারণ, তাহাতে আর কিছু না হউক, স্বামীর দর্শনলাভও ঘটে, স্বামীর সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রেম এমনি বটে! প্রেম আজ সুধাময়ীর হৃদয়ে

অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। তাহার এ প্রণয়ের মূল পরিণয়। পরিণয়ের প্রেম পবিত্র, স্থায়ী। পরিণয় ব্যতীত যে প্রেম, তাহাতে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখভোগের উপযোগী স্থায়িত্ব থাকে না; তাহাতে চাঞ্চল্য, আর পরিণয়োদ্ভূত প্রেমে গাম্ভীর্য্য; তাহা অস্থির, ইহা স্থির। পরিণয় ছাড়িয়া প্রণয়ে সংসার চালাইবার কল্পনা বাতুলের কল্পনামাত্র। তাহাতে সমাজ দুর্নীতি-পঙ্কে পচিতে থাকে। সে অবস্থায় সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

সুধাময়ী এখন স্বামীর প্রেমলাভাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—সে আজ স্বামীর প্রেমলাভের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল, কি করিলে জ্বালা জুড়ায়। কি করিলে স্বামীর ভালবাসা পাইব। হায়, এক বিন্দু ভালবাসা পাইলেই আমার তৃপ্তি! আমি আর অধিক প্রত্যাশা করি না। আর অধিক পাইবার অধিকারই বা আমার কি আছে? আমি তাঁহার সেই প্রেমের বিনিময়ে তাঁহাকে কি দিয়াছি!

সুধাময়ী কাঁদিতে লাগিল—ক্ষীণ গণ্ড দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এখন সুধাময়ীর ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় কি? এ যাতনার কথা আর কাহাকেও বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিবারও উপায় নাই।

সুধাময়ী ভাবিল,—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, পতির প্রেমরাজ্যে স্থান পাই কি না; যদি না পাই, তবে আর এ পাপজীবন রাখিয়া কি করিব? এ যাতনা আর সহিতে পারি না। আমি মরিব।

বাহিরে অবিরত বৃষ্টিপাত হইতেছিল; মেঘ মৃদু মন্দ গর্জ্জন করিতেছিল;—আজ বড় দুর্য্যোগ। আর সুধাময়ীর হৃদয়ে বুঝি তদপেক্ষাও ভীষণ দুর্য্যোগ।

হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া সুধাময়ী কাঁদিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃগৃহে।

আশ্বিনের শেষ। সুধীরচন্দ্রের কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অনুরোধে অতুলচন্দ্র বিবাহের দিন-পনের পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়াছে। সুধীরচন্দ্রের পত্নীর ইচ্ছা ছিল যে, সুধাময়ীকেও আনেন; কিন্তু কোন অনিবার্য্যকারণবশতঃ তাহাকে আনা হয় নাই।

আজ মধ্যাহ্নে সুধীরচন্দ্রের গৃহের দ্বিতলস্থ একটা কক্ষে সুধীরচন্দ্র, অতুলচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্রের পত্নীতে কথোপকথন হইতেছিল।

সুধীরচন্দ্রের পত্নী অতুলচন্দ্রকে বলিলেন, "ঠাকুর পো, যাহা যাহা কিনিতে হইবে, তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া তুমি বাজার সারিয়া ফেল। জানই ত তোমার দাদার রকম— সব কাজই 'হবে'। আর কি দিন আছে?"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "এখনও দশ দিন বাকি; ইহার মধ্যেই এত তাড়াতাড়ি কেন? একেবারে যে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ!"

"না, ঠাকুর-পো, তুমি কিছু শুনিও না। আর দেরী করিলে, তখন সব তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। জিনিসপত্র ভাল হইবে না, অথচ দাম অধিক লাগিবে।"

তাহার পর তিনি স্বামীকে বলিলেন, "আজ ত তিন

দিন বলিতেছি, স্যাকরাকে গহনাগুলার তাগিদ দিতে হইবে; লোক পাঠাইয়াছ?”

“ঠিক, ঠিক,” বলিয়া সুধীরচন্দ্র বারান্দায় যাইয়া সরকারকে ডাকিয়া, স্বর্ণকারের বাড়ীতে যাইতে বলিলেন।

তাঁহার পত্নী বলিলেন, “দেখিলে, ঠাকুর পো!”

অতুলচন্দ্র একটু হাসিল;—সুধীরচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

সুধীরচন্দ্রের পত্নী বলিলেন, “বরসজ্জার জিনিসগুলা ভাল দেখিয়া কিনিতে হইবে—জিনিস খারাপ হইলে কি বেহায়িন আর রক্ষা রাখিবে?”

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, “ইহার মধ্যেই এত ভয়!”

“তা ত বটেই! জান না ত, বাপ মার দোষে মেয়ে শাশুড়ীর কাছে কত গঞ্জনা খায়!”

“হাঁ, তোমাকে শাশুড়ীর কাছে বড় গঞ্জনা খাইতে হইয়াছিল!”

“আমার সঙ্গে কি সকলের কথা সমান? আমার শাশুড়ীর আমি এক ঘরের এক বৌ, মেয়ের অধিক আদর যত্ন পাইয়াছি। আর আমার শাশুড়ীর মত শাশুড়ী কি সকলেরই হয়? তোমার যে মেয়েকে আদর দিবার সময় মনে ছিল না যে, মেয়ে দু' দিন পরেই স্বামীর ঘর করিতে যাইবে।”

"মেয়েকে আদর দিব না ত আদর দিব কি ছেলেকে? ছেলে কুপুত্র হইলে, সারা জীবনে শান্তি পাইব না। মেয়ে দু'দিন কাছে থাকিল, তাহার পর আপনার ঘরে গেল; সেখানে সে ঘরের গৃহিণী, তাহার কার্য্য সে করিবেই। মেয়ের সঙ্গে ছেলে সমান?"

"মেয়ে স্বর্গে লইয়া যাইবে!"

"না, ছেলেই স্বর্গে লইয়া যাইবে! এত কষ্ট, এত অর্থব্যয়, হয় ত সব বৃথা যাইবে। তিনি কুপথে যাইয়া বংশের নাম কলঙ্কিত করিবেন, আর বাপ মা'র ভাগ্যে লোকের গালাগালি।"

"আচ্ছা, মেয়ের সবই ভাল।"

"রোগের সময় মেয়ে বাপের সেবা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; আর ছেলে ভাবে, কখন বুড়া মরিবে,—আমি টাকাগুলা হাতে পাইব।"

"হইল, মেয়েই সব—ছেলে কিছুই নয়। এখন মেয়ের বিবাহের বাজারটা শেষ করিয়া ফেল।"

"আচ্ছা, হইবে।"

"না।" ও 'আচ্ছা হইবে'তে চলিবে না। আজই ফর্দ্দ ঠিক কর।"

এই সময় এক জন চাকর একখানা রেজিষ্টারী চিঠি লইয়া আসিল। সুধীরচন্দ্র সহি করিয়া রসিদ্ ফিরাইয়া

দিলেন। পত্র খুলিতে খুলিতে তিনি বলিলেন, "ভবেশের পত্র।"

অতুলচন্দ্রের হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল।

সুধীরচন্দ্রের পত্নী বলিলেন, "কি লিখিয়াছে?"

সুধীরচন্দ্র পড়িতে লাগিলেন;—

শ্রীচরণকমলেষু,—

আপনার আশীর্ব্বাদপত্র পাইয়াছি। কল্য সকালে আমাকে সুপারিণ্টেন্‌ডিং এঞ্জিনিয়ারের সহিত কতকগুলা খালের তদারকে যাইতে হইবে। এখন কাজের বড় ভীড়; কেরাণীরা এখন ছুটী পায় না। 'সাহেব'কে ছুটীর জন্য বিশেষ করিয়া বলিলাম; কিন্তু কিছুতেই ছুটী মঞ্জুর হইল না।

শেফালিকার বিবাহ দেখা আমার অদৃষ্টে নাই। আমি যে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না, শেফালিকার বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না। সাহেবকে বলিলাম যে, ইংরাজের পিতৃব্য আর আমাদের পিতৃব্য একরূপ নহেন। আমাদিগের নিকট পিতৃব্য পিতৃ-তুল্য; বরং অনেক স্থলে পিতার অপেক্ষাও প্রিয়, কারণ, আদর আবদার পিতার কাছে চলে না, পিতৃব্যের কাছে চলে।

তাঁহাকে বলিলাম যে, যাঁহার গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া

অধঃপতন।

শিখিয়াছি, যাঁহার অন্নে এ দেহ বর্দ্ধিত, তিনি যাইতে লিখিয়াছেন, না যাইলে তিনি দুঃখিত হইবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

আমি যে আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না—এ সময়ে যাইতে পারিলাম না—আমার এ দুঃখ কোথায় রাখিব? আপনি কাকিমাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিবেন। আমি এত চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই ছুটী পাইলাম না।

শেফালিকার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে আমাকে একটা সংবাদ দিবেন; আমি বড় উদ্বিগ্ন থাকিব।

আমাকে কাল সকালেই রওনা হইতে হইবে। ফিরিয়া আসিতে প্রায় পনর দিন হইবে। আমাকে এখানেই পত্র লিখিবেন—আমরা যখন যেখানেই যাই, প্রতিদিন এখান হইতে পত্র যাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে।

আপনাদের মঙ্গলসংবাদ দিবেন। আমি ভাল আছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

প্রণত-সেবক
শ্রীভবেশ।

পুনশ্চ নিবেদন, শেফালিকার আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্নের জন্য যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইলাম। সে যাহা ভালবাসে, তাহাই কিনিয়া দিবেন।

একখানা নোট তুলিয়া সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছে।"

তাঁহার পত্নী বলিলেন, "খামকা কেন এত টাকা খরচ করিল! তবে সে আসিতে পারিল না?"

"শুনিলে ত।"

"তাহা যেন হইল। এখন ফর্দ্দটা ঠিক কর।"

অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। "খোকা বুঝি উঠিল"—বলিয়া সুধীরচন্দ্রের পত্নী উঠিয়া গেলেন।

ভবেশ আসিবে না শুনিয়া অতুলচন্দ্র যেন একটু স্বস্তি বোধ করিল।

সুধীরচন্দ্র অতুলচন্দ্রকে বলিলেন, "আমার সাংসারিক জ্ঞান একেবারেই নাই। তোমার বৌদিদির মত স্ত্রী না পাইলে, আমার দশা কি হইত বলিতে পারি না।"

অতুলচন্দ্র যেন চেষ্টা করিয়া একটু হাসিল।

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "স্ত্রীলোক না থাকিলে সত্যসত্যই এ জগৎ দানবের সৃষ্টি বলিয়া বোধ করিতাম। এত স্নেহ, এত মমতা, এত কোমলতা—এ যেন স্বর্গীয়! আর স্নেহ-বন্দিনী বঙ্গ-রমণী—জগতে যদি দেবী থাকেন, তবে সে বঙ্গ-রমণী। প্রতীচা-দেশের মহিলাদিগের উপর আমার অশ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়িতেছে। আমার মতে, স্ত্রীলোকের কর্ম্ম-

ক্ষেত্র, গৃহ; তাই, আমি স্ত্রীলোকের পুরুষভাব দেখিতে পারি না।"

যুবক-যুবতী হৃদয়ের প্রথম আকর্ষণে পরস্পরকে ভাল-বাসিতেই পারেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু বয়সের সহিত যাঁহারা সেই প্রেম জাগাইয়া রাখিতে পারেন, সেই প্রৌঢ় দম্পতিকে দেখিলে সত্যসত্যই বড় আনন্দ হয়।

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "আজই ফৰ্দ্দটা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে।"

অতুলচন্দ্র বলিল, "আচ্ছা।"

তাহার পর দুই ভ্রাতায় শেফালিকার বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে।

সেই দিন নিশীথে অতুলচন্দ্র আপনার ভ্রাতার কথা স্মরণ করিল—"তোমার বৌদিদির মত স্ত্রী না পাইলে আমার দশা কি হইত বলিতে পারি না।"

বুঝি তাহারও অজ্ঞাতে তাহার হৃদয় হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। সে একবার ভাবিল,—কেন আমিও অমনি বিশ্বাস করিতে পারি না? সে ত কেবল সুধাময়ীর ব্যবহারে!

তাহার পর অতুলচন্দ্র ভাবিতে লাগিল,—রমণী মানবের মহাশত্রু; জগতে মানবের যত কিছু অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে, সে সকলেরই জন্য রমণী দায়ী। রমণীর রূপ-বহ্নিতে রাক্ষসরাজের "কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্য-শালা সম" পুরী, বিরাট-বংশ, গগন-স্পর্শী তেজ, সকলই শুষ্কপত্রের মত দগ্ধ হইয়া গেল; রমণীর কটাক্ষে ট্রয়ের ধ্বংস, মৈসরীর মোহে বিশ্ব-বিজয়ী বীর আত্ম-ঘাতী; নারী-পদতলে কত শত ঋষি মুনির কঠোর তপস্যার ফল বিসর্জ্জিত!

সুধাময়ীর ব্যবহারে, নারীজাতির প্রতি অতুলচন্দ্রের একটা নির্ম্মম অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল,— রমণীর সম্বল কেবল চাতুরী, কেবল ছলনা। মূর্খ মানব

সেই ছলনায় ভুলিয়া থাকে! রমণীর কার্য্য কেবল মানবের সর্ব্বনাশ-সাধন; পুরুষের কর্ত্তব্য সেই সর্ব্বনাশ হইতে আপনাকে রক্ষা করা। রমণীর কি ভালবাসিবার ক্ষমতা আছে যে, সে ভালবাসিবে! স্নেহ বা ভালবাসা, ক্রোধ বা ঘৃণা রমণীর এ সকল কিছুই নাই। হৃদয়ের দৃঢ়তা না থাকিলে এ সকল স্থায়ী হয় না। রমণী-হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে কি? পুরুষের ভাগ্যে সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই হলাহল উঠে। পুরুষের মনোবৃত্তির সহিত তুলনায়, রমণীর মনোবৃত্তি, ভাস্করের জ্যোতির নিকট খদ্যোতের ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ আলোক; পুরুষের হৃদয়ের তুলনায়, রমণীর হৃদয় সুরার নিকট সলিল। এ জগতে রমণীর প্রকৃত স্থান পুরুষের অনেক নিম্নে; পুরুষের দাসীবৃত্তিই রমণীর উপযুক্ত কর্ম্ম। স্ত্রী-সমাজে শিক্ষার বা সভ্যতার বিস্তার করা বৃথা—তাহাতে বিপরীত ফল ফলে। তাহাতে স্বভাব-চতুরা রমণীর চাতুরী আরও বর্দ্ধিত হয়। পুরুষের পক্ষে তাহা আরও অমঙ্গলপ্রদ। রমণীর নিকট জ্ঞান বা গুণের প্রত্যাশা করা বাতুলের কল্পনা। লেখাপড়া শিখিলে রমণী পুংভাবাপন্না হইবার চেষ্টা করে—তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক; জগতের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর। অজ্ঞতার অন্ধ-তিমির-তলে পুরুষের দাসীরূপে তাহার আজ্ঞা-পালন করাই রমণীর একমাত্র কার্য্য! তাহার জ্ঞানের

প্রয়োজন কি,—তাহার শিক্ষার প্রয়োজন কি,—সভ্যতা লইয়া সে কি করিবে? যেখানে রমণী পুরুষের দাসী নহে, সেখানেই সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ-সাধনে উদ্যত হয়। শিক্ষা পাইলে, রমণী পুরুষের দাসী না হইয়া, পুরুষকে আপনার দাস করিতে বিধিমত চেষ্টা করিবে, সমাজে স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করিতে সচেষ্ট হইবে। রমণীর আবার অধিকার কি? সুবিধা পাইলেই রমণী সমাজ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া যাইবে; তাহার আবার চরিত্র! যাহার ভালবাসিবার ক্ষমতা নাই, ছলনাই যাহার একমাত্র মনোবৃত্তি, পাপের প্রতি যাহার আন্তরিক আকর্ষণ, তাহার আবার চরিত্র কি? রমণীকে শিক্ষা, সভ্যতা ও স্বাধীনতা দান করা, আর আপন হস্তে গরল তুলিয়া পান করা, পুরুষের পক্ষে একই কথা। রমণীর হৃদয়ের আকর্ষণই পাপের প্রতি—তাহার প্রতি আবার সম্মান!

অতুলচন্দ্রের এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! মানব-হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে রমণীর উন্নতির সহিত যে সমবেদনা লুক্কায়িত থাকে, অতুলচন্দ্র তাহা হৃদয় হইতে দূর করিয়াছে। যে বিশ্বাস নিরন্তর আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, রমণীর উন্নতি হইলে, আমাদিগের গার্হস্থ্য-জীবনে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইবে, জীবনের যাতনা প্রশমিত হইবে, অতুলচন্দ্র সে বিশ্বাসকে আর হৃদয়ে স্থান দান করে না।

পুরুষের ও রমণীর কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন, সন্দেহ নাই; কিন্তু পতি-পত্নীর সম্বন্ধ এমনি যে, স্বভাবতঃই পরস্পর পরস্পরের নিকট নানা কার্য্যে সাহায্য প্রত্যাশা করেন। এখন এমনি দাঁড়াইয়াছে, আমরা পতি-পত্নীর মানসিক অবস্থার বৈষম্য এমনি প্রবল করিয়া তুলিয়াছি যে, একের কার্য্যে অপরের কোনরূপ আকর্ষণ থাকে না। পত্নীর কথা এমন শিশু-সুলভ যে, তাহা শুনিতে পতির বিরক্তি জন্মে; আবার পতির কথা এমন যে, পত্নী তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারেন না। অনুশীলনাভাবে পত্নীর মানসিক বৃত্তি সকল সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। আবার অনুশীলন-ফলে পতির মানসিক বৃত্তিনিচয় বিশেষ উন্নতিলাভ করে, কাজেই যত দিন যায়, উভয়ের আদর্শের বৈষম্য ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। স্বামী আদর্শানুরূপ স্ত্রী না পাইয়া জীবন মরুময় অনুভব করেন; স্ত্রী ভাবেন যে, তিনি এক দিনের জন্য স্বামীকে সুখী করিতে পারি-লেন না—এক দিন আপনি সুখী হইতে পারিলেন না। একটা অতৃপ্ত পিপাসা, একটা দারুণ হতাশা পারিবারিক জীবন তিক্ত করিয়া তুলে। তাহার পর পত্নী আপনার সন্তানদিগকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন; পতি আপনার কার্য্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। উভয়েরই হৃদয়ে একটা গুরুভার চাপিয়া থাকে। পতি ভাবেন,—উপযুক্ত পত্নী

পাইলে জীবনের সব আশা মিটিত, জীবনে অনেক কার্য্য করিতে পারিতাম, এ মরুময় জীবন লইয়া সে সকল কিছুই হইল না, এ জীবন বৃথায় গেল! পত্নী ভাবেন,—পতি যদি একবার আপনার উচ্চাসন হইতে নামিয়া আসিতেন, যদি একবার আমার দিকে সদয় দৃষ্টিতে চাহিতেন, তবে আমি কৃতার্থ হইতাম; তাহাও হইল না!

এই অতৃপ্ত পিপাসা লইয়া কত যুবক আপনার সর্ব্বনাশ করে, তাহা কে বলিবে? গৃহে সুখ নাই, তাই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পাপের উত্তেজনায় তাহারা যাতনা ডুবাইতে চাহে। আবার যাহারা অল্পেই ব্যথিত হয়, তাহাদের অধঃপতন প্রায় বিবাহের পর হইতেই আরম্ভ হয়; দারুণ হতাশার প্রথম স্পর্শেই তাহারা সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, উন্নতির আদর্শ ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই অসুখে কত প্রতিভা বিনষ্ট হইয়া যায়, কত জীবন ধ্বংস হইয়া যায়, কত জনের গার্হস্থ্য-জীবন অসুখ ও অশান্তিময় হইয়া উঠে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে?

বর্ত্তমান সময়েই এই বৈষম্যের কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। নূতন সভ্যতার প্লাবনে আমাদের প্রাচীন আদর্শ ভাসিয়া যাইতেছে। হিন্দুর গৃহে হিন্দু-রমণীর প্রাচীন 'গৃহলক্ষ্মীর আদর্শ এখন বিলুপ্ত হইতেছে; অথচ

অধঃপতন।

আমরা কোন নূতন আদর্শও সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না।

এ সকল কথা অতুলচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছে। মানব-হৃদয় এমনি বটে! নারী-জাতির প্রতি একটা প্রবল অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ তাহার হৃদয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়াছে। অতুলচন্দ্র অধঃপতনের পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। মানব যতই হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিসমূহ হারায়, তাহার নীচবৃত্তি সকল ততই বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাই হৃদয়ের মহৎ বৃত্তি সকল হারাইয়া অতুলচন্দ্র ক্রমেই নীচমনোবৃত্তিসমূহের দাস হইয়া পড়িতেছে।

সুধাময়ীর ব্যবহার তাহার অধঃপতন আরও দ্রুত করিয়া দিতেছে।

তৃতীয় খণ্ড

ঝড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশা।

প্রথম পৌষের শীতল বাতাস বহিয়া যাইতেছে। দেবদারু তরুর অবশিষ্ট কয়েকটি জীর্ণপত্রও খসিয়া পড়িতেছে। মধ্যাহ্নের তপ্ত-তপন-করেও শীত ভাঙ্গিতেছে না।

পিতৃ-গৃহের একটা কক্ষে সুধাময়ী বসিয়া আছে—কোলে একটি শিশু। কার্ত্তিকের শেষে সুধাময়ীর একটি পুত্র হইয়াছে। অতুলচন্দ্র এ সংবাদ পাইয়াছে,—কিন্তু সুধাময়ী পিত্রালয়ে আসিবার পর সে আর একবারও তাহাকে দেখিতে আইসে নাই। সুধাময়ীর সাধের সময় শাশুড়ী প্রচলিত আচার অনুসারে একটা ছোট খাট তত্ত্ব করিয়াছিলেন—এই পর্য্যন্ত। আবার যাহারা তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের উপর কড়া হুকুম ছিল যে, তাহারা যেন সুধাময়ীর পিত্রালয়ে জলগ্রহণ না করে। সুধাময়ী আপনি ভৃত্যাদিগকে আহারাদি করিতে বলিয়াছিল; তাহারা উত্তর দিয়াছিল—"জানেন ত মা ঠাকুরাণীর রাগ। আমরা কিছু খাইলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না।" সুধাময়ী আর কিছু বলে নাই—কেবল কাঁদিয়াছিল। সুধাময়ীর পিতা মাতা বেহায়িনের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছু বলেন নাই। মেয়ের বাপ মা মেয়ের শাশুড়ীকে বড় ভয় করিয়া চলেন।

অধঃপতন।

সুধাময়ীর গণ্ডে অস্থি দেখা যাইতেছে, নয়নদ্বয় কোটরগত, দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। একে প্রসূতির দুর্ব্বলতা—তাহার উপর দুশ্চিন্তা!

কয়দিন মাত্র সুধাময়ী সূতিকা-গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। আজ একাকিনী বসিয়া, কোলের ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছে,—এ কি বন্ধনের উপর বন্ধন! তখন ভাবিয়াছিলাম,—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আমি মরিব; এখন দেখিতেছি, এই এতটুকু ক্ষুদ্র শিশু কোন্ অজানা দেশ হইতে আসিয়া আমার জীবনে নূতন আকর্ষণ দিয়াছে। এ কোথা হইতে আসিয়া আমার চির-ব্যথিত হৃদয় আনন্দিত করিল! এ কি।

তাহার পর সুধাময়ী ভাবিল,—আমি ত অপরাধ করিয়াছি; কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশু জগতের কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, ইহার উপরে তাঁহার এতটুকু দয়া হইবে না? এ ত আমারও সন্তান, তাঁহারও সন্তান; আমার যদি ইহার উপর এত স্নেহ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কেন হইবে না? হইবে। একবার ইহাকে দেখিলে কি তিনি ইহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন?

ধীরে ধীরে সুধাময়ীর জীবনের প্রতি এই আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

সহ[illegible]কি কেহ জীবন ত্যাগ করিতে চাহে? অতি অল্পমাত্র আকর্ষণ সত্ত্বেও যে সহসা জীবন ত্যাগ করে, সে হয় উন্মাদ, না হয় ক্ষণিক উত্তেজনার দাস। একটা কোন ঘটনার বা চিন্তার ক্ষণস্থায়ী উন্মাদকর উত্তেজনা নহিলে বড় দুঃখীও মরিতে পারে না। সংসারে যাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে, জীবনে তাহার মমতা থাকিবেই।

জগতে যাহার দুঃখ নাই, এমন লোক আছে কি? যদি দুঃখিমাত্রই জীবনত্যাগ করিত, তবে এত দিন জগৎ জনশূন্য মরুভূমি হইত। জগতে কাহার সকল আশা পূর্ণ হয়? হতাশমাত্রেই যদি জীবনত্যাগ করিত, তবে কে বাঁচিয়া থাকিত? যদি বেদনা পাইলেই মানব মরণকে আলিঙ্গন করিত, তবে হায়, হৃদয়ে এত যাতনা লইয়া এত জন জীবনযাপন করিত না! যাহার কোন আশা নাই, সেও আবার আশা করে। যাহার জীবনের সকল আকর্ষণ গিয়াছে, সেও নূতন আকর্ষণের সন্ধান করে। কেন? জীবনের প্রতি মানবের স্বভাবতঃই মমতা আছে বলিয়া। পত্নী, পুত্র, কন্যা, সকল চিতানলে সমর্পণ করিয়া জীবনের সকল সুখের শ্মশানে মানব আবার সুখান্বেষণে ব্যস্ত হয়। কেন? জীবন মানবের বড় প্রিয় বলিয়া। জীবনে সুখ কিসে?—যে জগতে কুসুমের পার্শ্বে কণ্টক, আশার পশ্চাতে নিরাশা, হাসির সহিত অশ্রু ও ভাল-

বাসার সহিত বেদনা বিজড়িত, সে জগতে সুখ কোথায়? যদি সুখ নাই, তবে জীবনের বোঝা বহি কেন?

যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, সে আবার নূতন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহার সংসারে সব গিয়াছে, সে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া বসে—আশায়। সংসারের নির্ম্মমতা মানব বড় সহজে ভুলিয়া যায়; কিন্তু সংসারের এক বিন্দু স্নেহ মানব ভুলিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই, মানব সংসারকে ভালবাসে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার দোষ আমরা বড় সহজে ভুলিয়া যাই; কিন্তু তাহার গুণ, তাহার স্নেহ সহজে ভুলিতে পারি না। নহিলে যাহার ব্যবহারে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াছ, যাহার জন্য জীবনের সুখ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আবার তাহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করে কেন? তাহারই জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে কেন? দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বল; কিন্তু এ দুর্ব্বলতা মানবের হৃদয়ের সহিত বিজড়িত। এ দুর্ব্বলতা না থাকিলে সংসার চলিত কি না সন্দেহ। প্রবৃত্তি হইতে এ দুর্ব্বলতার উৎপত্তি। নিবৃত্তিবাদী এ দুর্ব্বলতার নিবারণ করিতে পরামর্শ দিবেন; কিন্তু তাহাতে সংসারের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, সে কথা বিচার করা কর্ত্তব্য।

এই বিচিত্র শোভাময় জগৎ, এই সব হাসিমুখ, কে এই সকল সহজে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে? মানব

মনে করে,—এই বিশাল বৈচিত্র্যময় জগতে আমার ভাগ্যে কি সুখ জুটিবে না? দেখি, এক বিন্দু আনন্দ পাইবই। প্রেমসিন্ধু মন্থন করিয়া যাহার ভাগ্যে কেবল হলাহল উঠিয়াছে, সে সেই হলাহলের মধ্যে আবার অমৃতের সন্ধান করে। কেন? কারণ মানব স্বভাবতঃই মনে করে,—

"যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে' তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল্।
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল॥"

এই আশা—ছলনা বলিতে হয় বল,—মানবের মঙ্গলার্থ কি অমঙ্গলার্থ? এ আশা না থাকিলে, জগতে কয় জনের চেষ্টা সফল হইত? এ আশা না থাকিলে, হতাশ হইয়া গ্রন্থকার আর গ্রন্থ লিখিতেন না; একবার হতাশ হইয়া বা উপযুক্ত সম্মান না পাইয়া, বৈজ্ঞানিক আর আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে জগতের এ উন্নতি আজ কোথায় থাকিত? তাহা হইলে, মানব জগতের উন্নতি করা দূরে থাকুক, আত্মোন্নতি-সাধনও করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

এই আশা আছে বলিয়াই জীবনের প্রতি মানবের মমতা আছে, নহিলে কেহ জীবনের ভার বহিতে পারিত না।

অধঃপতন।

সন্তানলাভের পর হইতে সুধাময়ীর আশাও বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাই জীবনের প্রতি তাহার আকর্ষণও প্রবল হইয়াছে।

আজ শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া সুধাময়ী ভাবিতেছে,—এ ত আমারও সন্তান, তাঁহারও সন্তান, আমার যদি ইহার উপর এত স্নেহ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কেন হইবে না? হইবে। একবার ইহাকে দেখিলে, তিনি কি ইহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন?

সুধাময়ীর হৃদয়ে এই জননীত্বের বিকাশ; হৃদয়ের কঠোরতা এখন কোমলতায় পরিণত হইয়াছে;—হৃদয় এখন স্নেহময়। মাতৃত্বই রমণীর পূর্ণত্ব—তাহাতেই রমণী-হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশ। মাতৃত্বে হৃদয়ের কঠোরতা কেবল কোমলতায়, অন্য সকল বৃত্তি কেবল স্নেহে পরিণত হয়। জননীর সহিষ্ণুতা, জননীর ধৈর্য্য, জননীর স্নেহ, জননীর অপার্থিব ভাব রমণীর বিশেষ অধিকার—তাহাতেই রমণীর দেবীত্ব। যে সকল নারী-ভাব-বিবর্জ্জিতা রমণীর নিকট জননীত্ব অবৈধ বলিয়া বোধ হয়, তাহারা রমণীর দেবী-ভাব হারাইয়াছে। সম্মুখে জননীর আদর্শ, হিন্দু-বালিকা শৈশব হইতে অজ্ঞাতে সেই আদর্শের অনুকরণ করে; সেই মহান্ আদর্শ, সেই অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সেই অসীম স্বার্থত্যাগ, সেই অতুলনীয় স্নেহ,—হিন্দু-বালিকা শৈশব

হইতেই সেই আদর্শ লক্ষ্য ও অনুকরণ করে। তাহার পর সে যে আদর্শ দেখে, সেও জননীর আদর্শ। পতি-গৃহে শ্বশ্রূর আদর্শও জননীর আদর্শ ;—সেও সেই সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ ও স্নেহের আদর্শ। রমণীর আদর্শ এইরূপ বলিয়াই, হিন্দু-সংসার আজও অক্ষত রহিয়াছে।

নব-বিকশিত জননীত্ব এখন সুধাময়ীর হৃদয় স্নেহময় করিয়াছে। তাই আজ সন্তানের মুখ চাহিয়া সে ভাবিতেছে,—ইহাকে ভাল না বাসিয়া কেহ কি থাকিতে পারে? অতুলচন্দ্র পুত্রকে দেখিলেই ভালবাসিবে, ইহাই তাহার আশা।

পূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রাণত্যাগ করিবে। আজ সে ভাবিতেছে,—ইহাকে ছাড়িয়া যাইব! যাইতে পারিব?

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল,—একি মায়ার বন্ধন? এমন বন্ধন, এমন আকর্ষণ ত পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই! কোথা হইতে এই ক্ষুদ্র শিশু আসিয়া, আমার হৃদয়ের শূন্য অংশ পূর্ণ করিয়া দিল,—আমাকে যেন এক নূতন জগতে আনিয়া ফেলিল! ইহাকে এক দণ্ড না দেখিলে যাতনা বোধ করি,—সব শূন্য বোধ হয়—আর ইহাকে ছাড়িয়া চিরদিনের মত কোথায় যাইব? আর কি কখনও ইহাকে দেখিতে পাইব? এ পাপিনীর স্থান কোন্

নরকে হইবে—আর এই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশু—আমি ইহাকে আর দেখিতে পাইব না! ইহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? কেবল যদি ইহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমি সকল দুঃখ, সকল যাতনা সহিতে পারি। সব সহিতে পারি; কিন্তু ইহাকে ছাড়িয়া যাইব কেমন করিয়া? কেবল ইহাকে দেখিতে পাইব, এই আশায় আমি সব তিরস্কার, সব লাঞ্ছনা, সকল কলঙ্ক সহিতে পারি। আমি ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল,—এই বুঝি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বুঝি আমাকে যাইতেই হইবে;—কিন্তু আমি গেলে, এই ক্ষুদ্র শিশু—ইহার কি হইবে? হায়! বিমাতা কি ইহাকে যত্ন করিবে? হয় ত বা অনাদরে অনাহারে এই শিশু—আমার এই প্রাণের প্রাণ—জীবন ত্যাগ করিবে!

সুধাময়ী শিহরিয়া উঠিল। জননীর পক্ষে সন্তানের মৃত্যু-চিন্তার মত ভীষণ চিন্তা আর নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, পুত্রকে রাজত্ব দিবার জন্য, রমণী স্বামীকেও হত্যা করিয়াছে—রমণীর অপত্য-স্নেহ এমনই প্রবল। সুধাময়ী শিহরিয়া উঠিল—একটা অব্যক্ত ভীষণ যাতনায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সন্তানের দিকে চাহিয়া সুধাময়ী এমনি কত কি ভাবিতে লাগিল।

অপত্য-স্নেহ ধীরে ধীরে তাহাকে আবার জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুধাময়ী আপনা-আপনি বলিল, "কই তিনি ত একবার আসিলেন না!

*　　*　　*　　*　　*

সেই দিন অপরাহ্নে বহুদিন পরে অতুলচন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। অতুলচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিল। সে পুত্রকে দেখিতেও যায় নাই শুনিয়া সুধীরচন্দ্র তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরস্কারের পর অতুলচন্দ্র বুঝিয়াছিল যে, তাহার এইরূপ ব্যবহারে লোক নানা কথা বলিতে পারে। কলঙ্ক তাহারই সকলের অপেক্ষা অধিক। তাই সে স্থির করিয়াছিল যে, বাটী যাইবার পথে একবার শ্বশুরালয় হইয়া যাইবে—লোকের আর কিছু বলিবার থাকিবে না। সে বাটী যাইবার পথে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে।

এ দিকে সুধাময়ী ভাবিল,—তবে এত দিনে তাঁহার আমাকে মনে পড়িয়াছে; হয় ত আমার উপর তাঁহার একটুকু দয়া হইয়াছে। আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইব, আমি কি যাতনা ভোগ করিতেছি! যদি তিনি

একবার বলেন যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন! যদি তিনি আমাকে লইয়া যান! আমি তাঁহার চরণ-সেবা করিতে পাইলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। আমি না হয় শত অপরাধে অপরাধিনী—কিন্তু তাঁহার এ শিশু, ইহাকেও কি তিনি আপনার কাছে রাখিতে চাহিবেন না? কেন, জননীর অপেক্ষা কি জনকের স্নেহ অল্প? ইহাকে দেখিলে হয় ত তিনি আর ইহাকে রাখিয়া যাইতে পারিবেন না।

সুধাময়ী যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। আবার শত আশায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরাশা।

বড় আশায় সুধাময়ীর অপরাহ্ন কাটিয়া গেল। তাহার পর তপন মেঘমালার মধ্যে ডুবিয়া গেল,—দূর-তরুরাজির শ্যাম-শির অস্তগমনোন্মুখ রবিকরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ভাস্করের অস্ত-আলো নিবিয়া গেল; সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চল ধরণী আবৃত করিল। গগনে শত শত দীপ জ্বলিয়া উঠিল, যেন সন্ধ্যার অঞ্চলে শত হীরক ঝলসিতে লাগিল। নানা গৃহ হইতে আরতির শান্তি-শঙ্খধ্বনি সান্ধ্য-গগন শব্দিত করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা রাত্রিতে ডুবিয়া গেল। রাস্তা দিয়া খর্জ্জূর-রস-বিক্রেতা দ্রুত "খেজুর রস,—চাই খেজুর রস" হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া গেল। দুই একখানা নিতান্ত জীর্ণ শকট বিরক্তিকর শব্দ উৎপাদন করিয়া, পথ দিয়া চলিতে লাগিল; পা ঘসিতে ঘসিতে মুখে "ক্যাক ক্যাক" শব্দ করিয়া শকট-চালক সেই শ্রান্ত অশ্বযুগলকে আরও বেগে চলিতে উত্তেজিত করিতে লাগিল। পাড়ায় পাড়ায় সৌখিন বাবুদিগের গৃহে তবলার "ত্রে-কেটে-ধিন্-ধা" উঠিতে লাগিল।

সুধাময়ীর বোধ হইতে লাগিল, যেন আজ আর সময় যায় না—সে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অধঃপতন।

আমরা অধীর হই বা না হই, সময়-স্রোত দাঁড়াইয়াও থাকে না, নিয়ম অপেক্ষা অধিক দ্রুতও চলে না। সময় নিত্য যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল।

রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সুধাময়ী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আর কত আশাই করিতে লাগিল! সুখ-সুপ্ত শিশুর মুখ দেখিয়া জননী-হৃদয় কি আনন্দে, কি আশায়, আকুল হইয়া উঠিল! সুধাময়ী ভাবিল,—এই শিশু, ইহাকে দেখিলেও কি তাঁহার ক্রোধ যাইবে না?

সুধাময়ীর নয়ন-সম্মুখে একখানি সুখময় সংসারের চিত্র ভাসিয়া উঠিল; সে সুখময় সংসার অতুলচন্দ্রের ও তাহার। সেই সংসার উজ্জ্বল করিয়া, একটি শিশু বিরাজ করিবে—সে তাহার এই সুখ-সুপ্ত শিশু। অসীম আবেগে সুধাময়ী সন্তানের মুখ চুম্বন করিল। জননী-হৃদয়ের অসীম স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সুধাময়ী কল্পনা-নয়নে ভবিষ্যতের সুখ-চিত্র দেখিতে লাগিল। মানব কি স্বেচ্ছায় আপনার দুঃখ-দুর্দ্দশা কল্পনা করিয়া আপনাকে যাতনা দিতে চাহে? সুধাময়ী আপনার ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। অতুলচন্দ্র তাহাকে ক্ষমা করিবে। সন্তানের স্নেহে, পতির প্রেমে, তাহার তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে। সে অতীতের কথা

অতীত-স্বপ্নের মত ভুলিয়া যাইবে—সে সুখ পাইবে, শান্তি পাইবে। এমনই সুখে দিন কাটিবে। তাহার পর পুত্রকন্যায় পরিবেষ্টিতা হইয়া, অতুলচন্দ্রের পদধূলি মস্তকে লইয়া, সে প্রাণত্যাগ করিবে। হয় ত তাহার মৃত্যু-দিনে অতুলচন্দ্রের নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ঝরিবে,—সেই অশ্রুতে তাহার সর্ব্বপাপ, সকল আত্ম-গ্লানি বিধৌত হইয়া যাইবে। তাহার পর যদি পরকাল বলিয়া কিছু থাকে, তবে সেখানে আবার স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইবে।

বসিয়া বসিয়া সুধাময়ী এমনই কত কি ভাবিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ নিশা। সুধাময়ীর কক্ষের পশ্চাতে পানাপুকু-রের পাহাড়ে ঝিল্লীমন্দ্র-মুখরিত অন্ধকারে কোন্ ঝোপের অন্তরালে কোথায় একটা শৃগাল প্রহর ঘোষণা করিল। সে শব্দ দূরে যাইতে না যাইতেই বহু শৃগালের "হুক্কা হুয়া ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া" শব্দে নৈশ-গগন পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সুধাময়ী কক্ষের সম্মুখস্থ দালানে চটিজুতার শব্দ শুনিতে পাইল। আলস্য-মন্থরগমনে অতুলচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সুধাময়ী উঠিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। অতুলচন্দ্র যেন পদে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুর স্পর্শ অনুভব করিল।

সুধাময়ী উঠিল;—তাহার মনে পড়িল, পূর্ব্বে বহু দিন পরে সাক্ষাৎ হইলে, সে যখন স্বামীকে প্রণাম করিতে যাইত, তখন অতুলচন্দ্র তাহাতে বাধা দিয়া তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিত। তখন তাহার নিকট অতুলচন্দ্রের আলিঙ্গন, চুম্বন অর্থহীন বলিয়া বোধ হইত—তাহার উপর ঘৃণা বোধ হইত। আর আজ সেই আলিঙ্গন, সেই সুখের জন্য তাহার হৃদয়ে যে অসহনীয় তৃষ্ণা—তাহা এ জীবনে নিবারিত হইবে কি? স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া, অধরে স্বামীর অধর-স্পর্শজনিত সেই স্বর্গ-সুখানুভব, এ জীবনে সে আশা আর মিটিবে কি?

সুধাময়ী স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল—রুদ্ধ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর বাঁধ-ভাঙ্গা জলের মত তাহার নেত্রে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

ততক্ষণে অতুলচন্দ্র নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে যাইয়া, শয্যায় বসিল। তখন অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া, সুধাময়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?" সেই ক্ষুদ্র কথায় রমণী-হৃদয়ের যে যাতনা, যে মর্ম্মব্যথা, যে আকুলতা আজ প্রকাশ করিতে চাহিতেছিল, অতুলচন্দ্র তাহার কি বুঝিবে?

অতুলচন্দ্র উত্তর দিল, "মন্দ নহে।"

সুধাময়ীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করা অতুলচন্দ্র আবশ্যক মনে করিল না।

সুধাময়ী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সে মুখে এখন বিরক্তি-ভাব চিরস্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। সে বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, পুত্রকে কোলে করিয়া স্বামীকে বলিল, "একবার ইহাকে দেখিবে না?"

অতুলচন্দ্র বলিল, "কাহাকে?"

"তোমার এই সন্তানকে। আমি দোষ করিয়াছি—আমাকে পদাঘাত কর; কিন্তু এই শিশু, এ ত তোমারই সন্তান। ইহার উপর রাগ করিবে কেন?"

"তোমাকে কে বলিয়াছে আমি রাগ করিয়াছি? আমি এমন কথা বলি নাই। রাগ করিবার আমি কে?"

অতুলচন্দ্র কথাটা যে ভাবে বলিল, সুধাময়ী তাহা বুঝিতে পারিল না। অতুল কথাটা যে ভাবে বলিতেছিল, সুধাময়ী সে ভাবে লইতে পারে নাই। পারিবেই বা কেমন করিয়া? অতুলচন্দ্রের হৃদয়ে যে সন্দেহ হইয়াছিল, সুধাময়ী সে সন্দেহের কথা ভাবেও নাই।

সুধাময়ী ভাবিল,—এ বুঝি স্বামীর অভিমান! তাহার হৃদয়ে আশা হইল; সে ভাবিল, স্বামী বুঝি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। যাহার উপর ভালবাসা নাই, তাহার

উপর কি অভিমান হয়? সুধাময়ী ভাবিল,—আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম,—সন্তানের উপর যদি মাতার এত স্নেহ হয়, তবে পিতার স্নেহ হইবে না কেন? ইহাকে দেখিলে কি হৃদয়ে আর রাগ থাকিতে পারে?

সুধাময়ী বলিল, "রাগ কর নাই; কই, একবার ত ইহার কথা জিজ্ঞাসাও কর নাই? এত দিনে কি এক-বার ইহাকে দেখিতেও আসিতে পার নাই?"

অতুলচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল; জানি না, কেন সে বাক্যসংবরণ করিল।

সুধাময়ী বলিল, "কলিকাতায় যাইতে পারিয়াছিলে, আর একবার ইহাকে দেখিতে আসিতে পার নাই?"

বড় আশা করিয়াছিল বলিয়াই বহু দিন পরে আজ সুধাময়ী স্বামীর সহিত পূর্ব্বের মত কথা কহিতেছিল। অতুলচন্দ্র সুধাময়ীকে সেই পত্রগুলা দেখাইবার পর হইতে অতুলচন্দ্র তাহার সহিত আর ভাল করিয়া কথা কহে নাই, সেও আর সাহস করিয়া স্বামীর সহিত তেমন আলাপ করিতে পারে নাই।

তাহার কথার উত্তরে অতুলচন্দ্র বলিল, "কলিকাতায় অনেক কাজ ছিল, তাই সেখানে গিয়াছিলাম।"

সুধাময়ী বলিল, "কলিকাতায় তোমার কাজ ছিল, আর তোমার এ সন্তানকে দেখা কি একটা কাজ

নহে? তোমার কি একবার ইহাকে দেখিতেও ইচ্ছা হয় নাই?"

অতুলচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল; জানি না, কেন সে আবার বাক্য সংবরণ করিল।

সুধাময়ী বলিল, "ইহাকে দেখিয়াছ?"

অতুলচন্দ্র বলিল, "দেখিয়াছি।"

সুধাময়ী বলিল, "কেমন, ইহাকে দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না?"

অতুলচন্দ্র কোন কথা কহিল না।

সুধাময়ী পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে দিতে গেল।

অতুলচন্দ্র সরিয়া গেল।

বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুধাময়ী দেখিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখে পৈশাচিক ঘৃণার ভাব। সুধাময়ীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

তীব্রতম-ঘৃণা-ব্যঞ্জকস্বরে অতুলচন্দ্র বলিল, "ও কাহার সন্তান,—আমি কোলে লইব?"

এতক্ষণে সুধাময়ী অতুলচন্দ্রের কথার মর্ম্ম বুঝিল। তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুধাময়ী কাঁদিতে চাহিল—কান্না আসিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পদতলে।

অপ্রত্যাশিত আঘাতের প্রথমবেগসংবরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; সেই প্রথমবেগ সহ্য করিতে পারিলে, তাহার পর বুদ্ধির স্থিরতা ফিরিয়া আইসে। অতুলচন্দ্রের কথা শুনিয়া সুধাময়ীর বোধ হইল, যেন তাহার পক্ষে জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন আলোক নিবিয়া গেল। সুধাময়ী স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর শিশুকে শয্যায় রাখিয়া, হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, দুই করে মুখ আবৃত করিয়া, সুধাময়ী কাঁদিয়া মনের ভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিল। এতক্ষণে অশ্রু বহিল। হৃদয়ের কোন্ নিভৃতপ্রান্তে কোন্ নির্ম্মল উৎসের বিমল বারির মত সেই অশ্রু তাহার যাতনা যেন একটু প্রশমিত করিল। যাতনায়, মর্ম্মব্যথায়, শোকে, দুঃখে, অশ্রুর মত সান্ত্বনাদায়ী আর কিছুই নাই। যে যাতনায়, মর্ম্মব্যথায় রোদন করিতে পারে না, সে সংসারে একটা প্রধান সুখে বঞ্চিত। সেই তপ্ত অশ্রুরাশিতে সুধাময়ীর হৃদয়ের অসহনীয় যাতনা যেন সহনীয় হইয়া আসিল। সেই অসীম যাতনায় সে যেন আপনাকে একটু সুস্থ বোধ করিল।

সুধাময়ীর এত আশা ভস্মসাৎ হইয়া গেল! এত দিন

সন্তানের মুখ চাহিয়া সুধাময়ী যত আশা করিয়াছে—আশার ভিত্তি না থাকিলেও সে যে আকাশ-কুসুমের কল্পনা করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছে, জীবন রাখিতে পারিয়াছে, বুঝি বা এতটুকু শান্তি পাইয়াছে, আজ তাহার সে সকল আশা দূর হইয়া গেল! যেমন সাগরের একটিমাত্র তরঙ্গ আসিয়া, বহু যত্নে বহু দিনে নির্ম্মিত বল্মীক-স্তূপ বিধৌত করিয়া লইয়া যায়, তেমনই আজ স্বামীর একটিমাত্র মর্ম্মভেদী বাক্য তাহার সকল আশা নষ্ট করিয়া দিল! সুধাময়ী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুধাময়ী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর সেই মর্ম্মভেদী কথাটা বলিয়া, অতুলচন্দ্র বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। সে ভাবিল, প্রতিহিংসাতেই আমার এখন সুখ; যে আমাকে যাতনা দিয়াছে, তাহাকে যাতনা দেওয়াই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; ক্ষমা কাপুরুষতামাত্র। উচ্চ মনোবৃত্তি হারাইয়া, কোন দুষ্কার্য্য করিলে মানব যেমন করিয়া আপনাকে প্রবোধ দেয়, অতুলচন্দ্র তেমনই করিয়া আপনাকে প্রবোধ দিল। তাহার প্রতিহিংসা-বৃক্ষে ফল ফলিতেছে। নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতার সহিত সে ভাবিতে লাগিল, অশ্রু—রমণীর অশ্রুর কি কোন মূল্য আছে? ঐ অশ্রুই ত আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ঐ অশ্রুর মোহই ত আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল! রমণীর

অশ্রু! চরিত্রহীনার অশ্রু! ও অশ্রু কেবল ছলনা—মূর্খকে ভুলাইবার চেষ্টা,—দুর্ব্বল-চিত্তকে মুগ্ধ করিবার অস্ত্র;—ও ছলনায় আমি আর ভুলিব না। এত দিন যে ভুলিয়াছিলাম, ইহাই আশ্চর্য্য!

সুধাময়ী ভাবিল, এ কথা সে পূর্ব্বে কেন ভাবে নাই? কেন অবহেলা, ঘৃণা, যাতনা সহিবার জন্য সে এই নিষ্পাপ শিশুকে সংসারে আনিয়াছিল? কেন সে মরে নাই! আপনার জন্য নহে—এই শিশুর জন্যই সে কেন মরে নাই! এই শিশু—তাহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর—এ অনাদৃত হইবে! তাহার পর যদি শিশু অযত্নের ও ঘৃণার কারণ জানিতে পারে—তবে? তবে যাহার জন্য সে এত যাতনা সহিয়াছে, আপনার দেহক্ষয় করিয়া যাহার দেহ বর্দ্ধিত করিয়াছে, আপনার হৃদয়-শোণিতে যাহাকে পুষ্ট করিয়াছে, সেই সন্তান তাহার অভাগিনী জননীকে অভিসম্পাত করিবে। সে ভাবিবে—এত যাতনা, এত ঘৃণা—এ সকলের মূল আমার জননী; তাঁহারই পাপে আমার এ দুঃখ। তিনি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়া করাইতেছেন। তিনি কেন বিশ্বাস-হন্ত্রী হইয়াছিলেন? তাহার পর দিনে দিনে, পলে পলে, যাতনা সহিবার জন্য আমাকে না রাখিয়া, কেন জন্মমাত্রেই আমার জীবননাশ করেন নাই? সন্তানের সেই

অভিসম্পাত চিরপ্রজ্বলিত নরকাগ্নির মত জননীর প্রেতাত্মাকে দগ্ধ করিবে। ইহারই জন্য কি সে সন্তানের উপর এত আশা স্থাপন করিয়াছিল?

অব্যক্ত যাতনায় সুধাময়ীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

সে ভাবিল,—বাপের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, যদি ছেলের মনেও সেই সন্দেহ উপস্থিত হয়? যদি সেও ভাবে,—আমি কাহার সন্তান? আমার জীবন আদ্যোপান্ত রহস্যময়—আমার জীবনের প্রারম্ভ হয় ত পাপের কলুষিত ইতিহাস! যদি তাহাই হয়, তবে জগতে কাহার প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য আছে? আমি উৎসন্ন যাইলে কাহার কি ক্ষতি? তাহার পর যদি সে ভাবে,—পাপজীবন রাখিয়া কোন ফল নাই? যদি সে তাহার জননীকে তাহার জন্মের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করে? যদি সেও জননীকে বিশ্বাস না করে? যদি মাতার চক্ষের সম্মুখে সে উৎসন্ন যায়, বা জীবন ত্যাগ করে, তাহা হইলে স্বচক্ষে তাহার সে যাতনা দেখিতেই কি সে সন্তানকে জগতে আনিয়াছিল? সারা জীবন তাহারই মত যাতনা সহিবে বলিয়া কি সে সেই সন্তানকে জগতের আলোক দেখাইয়াছিল?

সুধাময়ী ভাবিল,—কেন সে এত আশা করিয়াছিল,

কেন সে এত দিন মরে নাই? সন্তানের অভিসম্পাত ভোগ করিতেই কি সে সন্তানের জন্য এত কষ্ট সহিয়াছিল? বৈশাখ,—জ্যৈষ্ঠ,—আষাঢ়,—শ্রাবণ,—ভাদ্র,—আশ্বিন,—কার্ত্তিক,—অগ্রহায়ণ, কি আশায় সে এই দীর্ঘ আট মাস কাল এত যাতনা সহিয়াছে! যে দিন অতুলচন্দ্র তাহাকে সেই পত্রগুলা দেখাইয়াছিল, সেই দিন মরিলেই ত সব জ্বালা জুড়াইত; সত্যই কি তাহার কলসী দড়ি জুটিত না? তবে কি আশায় সে এত যাতনা সহিয়াছে? এই সন্তানের জন্য। সে তাহার ভ্রান্তি; সেই তাহার জীবনের মহাভুল। সে ভুল সে কেন করিয়াছিল? সে ভুলের ফল কেবল আজিকার এই হতাশা নহে। সে দিন যদি সে মরিত, তবে চিরদিন তাহার মত যাতনা সহিবার, চিরজীবন তাহাকে অভিসম্পাত করিবার কেহ থাকিত না—সে তাহার চিহ্ন মুছিয়া যাইতে পারিত। কেন সে তাহা করে নাই? কেবল এই সন্তানের জন্য। কি দারুণ ভ্রম! হয় ত পিতৃ-গৃহে শিশুর স্থান হইবে না। তখন?—তখন তাহার স্থান রাজপথ। এই সঙ্কট-শঙ্কিল, প্রলোভনপূর্ণ, পাপময় সংসারে তাহার একমাত্র আশ্রয়—রাজপথ! সুধাময়ী শিহরিয়া উঠিল।—সে কাহার পাপে? তাহার সেই অভাগিনী জননীর। পাপের নিবৃত্তি কোথায়? পাপ-স্রোত কোথায় যাইয়া শেষ হইবে?

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ করিলেই কি তাহার ফলভোগ করিতে হইবে? হইবে না কেন—না জানিয়া বিষপান করিলে কি মরণ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল নহে? তবে? এইবার তাহার বিষ-বৃক্ষে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে কেন সে ঐ ক্ষুদ্র শিশুকে রাখিয়া যাইবে? যদি সব আশাই নির্ম্মূল হইয়া গেল, যদি সব স্বপ্নই নিষ্ফল হইল, তবে আর কিসের আশায় সে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহিবে—কেন বাঁচিয়া থাকিবে? আর বাঁচিয়া লাভ কি? যদি আপনি মরে, তবে কি জন্য কাহার নিকট শিশুকে রাখিয়া যাইবে? সেই শীতল-সমীরসেবিত নিশীথে সুধাময়ীর সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-সিক্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর সুধাময়ী ভাবিল,—আর একবার দেখি, তখন যাহা করিতে হয় করিব।

উন্মাদিনীর মত উঠিয়া সুধাময়ী পতির পদে মুখ লুকাইল।

অতুলচন্দ্র সবেগে পা টানিয়া লইল, যেন সে তাহার পদে বিষধরের স্পর্শানুভব করিয়াছে।

সুধাময়ীর বিষম বেদনা লাগিল; কিন্তু তখন তাহার মানসিক যাতনা এত অধিক যে, শারীরিক যাতনার

কথা তাহার মনেই হইল না; সে কেবল একবার মুখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিল। তাহার পর সে স্বামীকে বলিল, "আমি যে যাতনা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাকে ক্ষমা কর।"

অতুলচন্দ্র ঘৃণার হাসি হাসিল।

সুধাময়ী বলিল, "আমি আর কিছু চাহি না—আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নহি—কেবল পদসেবা করিতে পাইলেই কৃতার্থ হইব; আমাকে চরণে স্থান দাও।"

তীব্রতম-ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে অতুলচন্দ্র বলিল, "এত ভক্তি কত দিন হইয়াছে? আমি জানি, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!' আমার কাছে আর ছলনা কেন?"

সুধাময়ী আবার স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিতে গেল। অতুলচন্দ্র সরিয়া গেল; সুধাময়ী হর্ম্ম্যতলে পড়িল।

এমন সময়ে সুধাময়ীর শিশু জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুধাময়ীর হৃদয়ে সে ক্রন্দন দারুণ আঘাতের মত বাজিল। সে ছুটিয়া গিয়া শিশুকে কোলে করিল—শিশু শান্ত হইল। জননীর স্পর্শে কি আছে জানি না—জননীর স্পর্শেই শিশু ক্রন্দন ভুলিয়া যায়।

সুধাময়ী স্বামীকে বলিল, "আমাকে চরণে স্থান দিও না; কিন্তু এই শিশু—ইহাকেও কি স্থান দিবে না?"

নির্ম্মমভাবে অতুলচন্দ্র উত্তর করিল, "আমি কে?"

সুধাময়ী বলিল, "আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর, অন্তর্যামী জানেন,—এ সন্তান তোমার। আমি তোমায় মিথ্যা বলিতেছি না—ইহার অধিক আমার আর কিছু বলিবার নাই।"

অতুলচন্দ্র কিছু বলিল না।

সুধাময়ী বলিল, "তোমার চরণে স্থান না পাইলে আমার আর কোথাও স্থান হইবে না। তখন এই শিশু অনাহারে অযত্নে মরিলে কলঙ্ক তোমারই হইবে।"

অতুলচন্দ্র অতি কদর্য্য উত্তর করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সে আর সে কথা বলিল না।

তখন সুধাময়ী বলিল, "জননীর পাপ ভুলিয়া যাইও। এই শিশুকে দিয়া, তাহার জননীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইও না। তোমার চরণে আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই।"

অতুলচন্দ্র বলিল, "আমার কর্ত্তব্য আমি করিব। আমি কাহারও কাছে কোন পরামর্শ বা উপদেশ চাহি না।"

সুধাময়ী বলিল, "আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিলে তাহা কলুষিত হয়। এ জগতে আর আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি মরিব। আমি মরিয়াছি শুনিলে, আমাকে ক্ষমা করিও। তুমি ক্ষমা না করিলে নরকেও আমার স্থান হইবে না। আশীর্ব্বাদ করিও,—জন্মান্তরে যেন তোমার

পদসেবা করিয়া অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি। আর এই শিশু—বিধাতা ইহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে—আমি আর কি বলিব!”

অতুলচন্দ্র কোন কথা কহিল না।

তাহার পর দিবস প্রাতে শ্বশুর শাশুড়ীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও অতুলচন্দ্র গৃহে চলিয়া গেল।

সুধাময়ীর সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদীর্ণ হৃদয়।

পৌষের অপরাহ্ন ; পল্লবরাগ-তাম্র তপন সমুদ্রের অনন্ত-প্রসারিত নীলজলে ডুবিতেছে ; তপনকিরণ আকাশে লোহিতাভ মেঘ ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে। নিম্নে নীল জল, আর ঊর্দ্ধে লোহিত আকাশ ;—অপরাহ্নের শোভা বড় মধুর, বড় মোহন, বড় মনোরম। সমুদ্রের জলের উপর বহু জলচর বিহঙ্গম কলরব করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, তীরেও নানা-জাতীয় পক্ষী কূজন করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে। মহিষ ও গরুর পাল লইয়া উড়িয়া রাখাল ধূলিপূর্ণ-পথে মাঠ হইতে গৃহে ফিরিতেছে। উৎকল-রমণীরা পূর্ণকলস-কক্ষে গৃহে ফিরিতেছে।

বাঙ্গালায় এ সময় যত শীত, সমুদ্রতীরবর্ত্তী উড়িষ্যার সহরে এখন শীত তত প্রখর নহে।

আফিসের কাজ সারিয়া এক জন বাঙ্গালী গৃহে ফিরিতেছে। তাহার মুখে চিন্তার গভীর ছায়া। আর যেন উদ্বেগে তাঁহার মুখভাব একটু চঞ্চল দেখাইতেছিল ;—এই ভবেশ।

এই কয় মাসে ভবেশের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এখন তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারা সহজ নহে। তাহার প্রফুল্ল মুখে বিষাদ ও চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত ; মস্তকের

দুই পার্শ্বে দুই চারিটা চুল পাকিয়াছে; অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্নে তাহার যৌবনলাবণ্য আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভবেশ কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসে না—একাকী থাকে। চাকরীর জন্য যে সকল বাঙ্গালী বিদেশে থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই মিলিয়া মিশিয়া আমোদে দিনাতিপাত করেন, আর বলিতে কি, অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। কিন্তু ভবেশ কাহারও সহিত মিশিতে চাহিত না,—সেই জন্য সেখানকার বাঙ্গালী-সমাজে তাহার নাম ছিল "দার্শনিক"। ভবেশ একাকী এক গৃহে থাকিত, সময়মত আফিসে যাইত, তাহার পর আফিস হইতে ফিরিয়া আবার গৃহে ঢুকিত; প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইত না। কদাচিৎ একদিন বেড়াইতে ইচ্ছা হইলে, কাহারও গৃহে না গিয়া কিছু ক্ষণ সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া আসিত। সে দিন পথে কোন বাঙ্গালীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বন্ধুদিগের নিকট বলিতেন যে, তিনি ডুমুরের ফুল দেখিয়াছেন। তাহা লইয়া তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে সে দিন যথেষ্ট হাস্যবিদ্রূপ চলিত—অনুপস্থিত ভবেশের উপর অনেক বাক্যবাণ বর্ষিত হইত। ভবেশ সে সকল শুনিতেও পাইত না।

তবে ভবেশ আফিসের 'সাহেবে'র বড় প্রিয় ছিল।

তাহার একদিনও আফিসে আসিতে বিলম্ব নাই, একদিন কোন কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া যাওয়া নাই, আর মধ্যে মধ্যে ছুটি লওয়ার হাঙ্গামা নাই। ঘড়ির কাঁটা যেমন ঠিক সময় বাঁধিয়া ঘুরিয়া যায়, ভবেশ তেমনই ঠিক সময় বাঁধিয়া কাজ করিয়া যাইত। ধীর, শান্ত, স্থির, কর্ম্মরত, কষ্টসহিষ্ণু লোকটিকে দেখিয়া অস্থির, অধীর চঞ্চল স্কচের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইত। তিনি ভাবিতেন, আমার কুকুর, বন্দুক, উপন্যাস, আর আফিসের কাজ; তবুও সময় কাটে না! আর কেবল আফিসের কাজ লইয়া এই ভদ্র প্রাণীটির কেমন করিয়া কাল কাটে? এক এক দিন নিতান্ত জিদ করিয়া তিনি ভবেশকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে দুই চারখানা উপন্যাস পড়িতে দিতেন। সে জন্য ভবেশ আপনার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইত না।

এক দিন স্কচ ভবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু, বাটীতে আপনার কে কে আছেন?"

ভবেশ বলিল, "পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, সবই আছেন।"

"আপনাদের কি একান্নবর্ত্তী পরিবার?"

"না।"

"আমি শুনিয়াছি, আপনাদের ধর্ম্মানুসারে আপনা-দিগকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিতে হয়। আপনি বিবাহ করেন নাই কেন?"

"ধর্ম্মে এমন কিছু বিধান নাই; তবে ক্রমশঃ লোকাচার তাহাই দাঁড়াইতেছিল। এখন আবার জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় সে আচার পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।"

"আপনি কবে বিবাহ করিবেন?"

"আমি বিবাহ করিব না।"

"কেন? প্রথম বয়সে একটা ছোট খাট প্রেমাভিনয় হইয়াছিল নাকি? আপনি জানেন, আমি এবার ছুটী লইয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিব।"

"আপনার দাম্পত্য-জীবন যেন সুখময় হয়।"

"ধন্যবাদ। বাবু, আপনার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হয় না?"

"না।"

"আপনাদের সম্বন্ধে আমাদের কি ভ্রান্ত সংস্কারই থাকে! আমার ইংরাজ-বন্ধুরা বলেন যে, আপনারা স্ত্রী-জাতি অপেক্ষাও ভীরু, আদৌ কর্ম্মক্ষম নহেন, বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহেন না, ইত্যাদি। আমি দেখি, আপনারা মনুষ্যত্বে আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আচ্ছা বাবু, আপনি বলিতে পারেন,

ইংরাজেরা আপনাদের এত ঘৃণা করে কেন? আমরা—স্কচরা -সেরূপ করি না।”

“আমরা বিজিত, আর তাঁহারা জেতা; অথচ আমাদের কিছু বিদ্যাবুদ্ধি আছে। এ স্থলে বিজিতের প্রতি জেতার ঘৃণা বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় কি? আপনাদের অনেকের নাম আমাদের দেশের লোক চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। কয়েক জন স্কচকে আমরা সহজে ভুলিতে পারিব না। আমরা আর যাহাই হই, অকৃতজ্ঞ নহি।”

‘সাহেব’ ভবেশের সহিত এইরূপ আলাপ করিতেন। ইংরাজে ও স্কচে প্রভেদ অনেক।

আজ ভবেশের চিন্তা-ছায়া-ব্যাপ্ত মুখে চিন্তার চিহ্ন যেন আরও গাঢ়—আরও গভীর। ধীরে ধীরে ভবেশ আপনার গৃহে উপনীত হইল। ক্ষুদ্র একতল গৃহ; কিন্তু গৃহে শোভা বা শৃঙ্খলার কিছুই অভাব দৃষ্ট হয় না; দেখিলেই বোধ হয়, গৃহস্বামী সুরুচি-সম্পন্ন। কেবল গৃহস্বামীর শয়ন-কক্ষ অন্যরূপ। ভবেশ প্রায় সেই ঘরেই থাকে। সে ঘরে শৃঙ্খলার অভাব। একটি শয্যা, একখানি চেয়ার, একটা টেবিল,—সে ঘরের এই সাজ সরঞ্জাম।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া, বারান্দায়

হাত মুখ ধুইয়া, ভবেশ সেখানেই বসিল। তাহার পর সামান্য কিছু জলযোগান্তে সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া সে একেবারে শয্যার আশ্রয় লইল। ভবেশের উৎসাহ যেন তাহার আফিসের পোষাকের সহিত বিজড়িত ছিল; সে পোষাক পরিলেই তাহা আসিত, আবার সে বেশ ত্যাগ করিলে সে উৎসাহ চলিয়া যাইত। আফিসে যাইবার পূর্ব্বে বা পরে তাহার আর বিন্দুমাত্র উৎসাহ দৃষ্ট হইত না। আফিসের কাজের সময় তাহার সেই কার্য্যোপযোগী উৎসাহ লক্ষিত হইত। গৃহে ফিরিলে তাহার আর কিছু থাকিত না।

আসল কথা, একটা কেমন অলসভাব তাহার মনে চিরস্থায়িরূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পক্ষে তাহা দূর করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। নিরাশা-বিদীর্ণ হৃদয়ে যে উৎসাহহীনতা, যে বিষণ্ণতা, যে কোন-কাজ-ভাল-না-লাগা-ভাব অবশ্যম্ভাবী, ভবেশের হৃদয়ে তাহাই আসিয়াছিল।

যেন একটা অব্যক্ত ভীষণ যাতনায়, অসহনীয় দারুণ মর্ম্মব্যথায়, একটা কি গুরুতর ভাবে ভবেশ পীড়িত হইতেছিল। তাহার বুঝি আর কোন উপায় নাই।

ভবেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ মাঘমাসের প্রথমেই হইবে। তাহার পিতা তাহাকে বাটী যাইতে লিখিয়াছেন। কাল পিতার পত্র পাইয়া অবধি, ভবেশের বিষাদভরা মুখে

বিষাদের ছায়া যেন আরও গাঢ়—আরও গভীর বলিয়া বোধ হইতেছে। কাল সারারাত্রি ভবেশ ঘুমাইতে পারে নাই। হায়! তাহার ভ্রাতা কিছু দিন পূর্ব্বে বিবাহ করিলে, হয় ত জীবনে এত যাতনা সহিতে হইত না, হয় ত জীবন-স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত হইত। "হয় ত" কেন?—"নিশ্চয়ই"। তাহা হয় নাই বলিয়াই আজ সে আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে এত দূরে—একাকী, প্রবাসী। তাহা হয় নাই বলিয়াই আজ তাহার প্রাণে এ মরুভূমি! তাহা হয় নাই বলিয়াই আজ এ যাতনা! তাহা হয় নাই বলিয়াই জীবন অনন্ত-যাতনার অরুন্তুদ কাহিনী! তাহা হয় নাই বলিয়াই জীবনের সকল আশা নিষ্ফল হইয়াছে। তাহা হয় নাই বলিয়াই তাহার জীবনে একবিন্দু সুখ মিলিল না!

ভবেশের মানস-নয়নসমক্ষে দুইখানি চিত্র ভাসিয়া উঠিল। একখানি সুখ-শান্তি-পূর্ণ সংসারের মনোরম ছবি—দুঃখ দুর্দ্দশার মসী সে চিত্র মলিন করে নাই; তাহার কোথাও একটি মলিন বিন্দু নাই। সে যেন চিরসুখময় অমরাবতীর ছবি,—যেন তাহা মর-জগতে অমরতার আস্বাদ; এ দুঃখ-তাপময় সংসারে অনন্তসুখের আভাষ; চির-অশান্তির সংসারে চিরশান্তির মনোহর চিত্র। সে সংসারে,—সে—সে আর?—

আর একখানি চিত্র নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের। সেই বিকচ-কুসুম-শোভাময়, বিহগ-কলতান-মুখরিত রম্য নন্দন-কানন দানব-পদ-দলিত,—সে সুখ-শশী চিররাহু-গ্রাসে। সে সুধা-ভাণ্ড পদাঘাতে চূর্ণ! সে সংসার নাই,—সে সুখ নাই,—সে শান্তি নাই! আছে কেবল যাতনা, কেবল মর্ম্মব্যথা, কেবল দুঃখ। সে সংসার নাই; কিন্তু সেই সংসারের দুই জন? সে আজ এই বিদেশে একাকী এই যাতনা সহিতেছে। পীড়ার সময় তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই,—স্নেহ-করস্পর্শে তাহার যাতনা লাঘব করিবার কেহ নাই,—মৃত্যুকালে তাহার পিপাসা-শুষ্ক অধরে এক বিন্দু জল দিবার কেহ নাই; এই বিশাল জগতে তাহার সব থাকিতেও কেহ নাই! অদ্ধাশন-ক্লিষ্ট পথের ভিক্ষুকও বুঝি তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান্। তাহার মত দুঃখী বুঝি এ সংসারে আর কেহই নাই। এই ত গেল তাহার কথা। আর, সেই আর এক জন?—সেও বুঝি তাহারই মত জীবনে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!

কেন এমন হইল? এই মর্ম্মব্যথার, এই যাতনার কারণ কি? সে কি দোষ করিয়াছিল?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভবেশ অধীর হইয়া উঠিল। তবে আর যাহাই হউক, ভবেশ এইটুকু বুঝিয়াছিল যে,

স্মৃতি এ জীবনে মুছিবার নহে। সে তাহা ভুলিতে পারিবে না। মানব-হৃদয় দুর্ব্বল—দুঃখের উপর আর দুঃখ বাড়াইয়া ফল কি? আর—সে ত ইচ্ছা করিয়াই আত্মীয় স্বজন সব ছাড়িয়া আসিয়াছে; তবে আর কেন? জীবনে যাহার আর কোন আশা নাই, যাহার মনে কোন সুখ নাই, যাহার পক্ষে জীবন মরুতুল্য, বরং মরিলে যাহার যাতনা জুড়ায়, তাহার আর বন্ধনের উপর বন্ধনের বৃদ্ধি কেন?

ভবেশ স্থির করিল, সে আর দেশে ফিরিবে না।

তাহার পর ভবেশ ভাবিল,—এ কথা বাপকে লিখিব কি? আমি পিতা মাতার কুপুত্র, এক দিনের জন্য তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারি নাই, আবার এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে আরও দুঃখ দিব?

ভবেশ বহুক্ষণ ভাবিল; তাহার পর আপনা-আপনি বলিল,—"না লিখিয়াই বা কি করিব? একটা মিথ্যা কথা বলিব? তাহা হইলে, না হয় একবার—দুইবার কাটাইতে পারিব; কিন্তু তাহার পর?—না, আর যাহাই করি, পিতা মাতার সহিত এমন করিয়া মিথ্যাচরণ করিতে পারিব না।

ভবেশ এইরূপ ভাবিতেছিল, এমন সময়ে তাহার উড়িয়া' ভৃত্য কক্ষে আলোক লইয়া আসিল। ভবেশ

উঠিয়া বসিল। ভৃত্য আলোক রাখিয়া চলিয়া গেল; ভবেশ আবার ভাবিতে লাগিল।

সেই দিন রাত্রিতে ভবেশ পিতাকে লিখিল;—

শ্রীচরণকমলেষু,—

আপনার আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইয়াছি। এত দিনে দাদা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন, জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

দাদার বিবাহে আমি যাইতে পারিব না। আমার আর দেশে ফিরিতে ইচ্ছা নাই। যদি মাতা ঠাকুরাণী একবার জগন্নাথ-দর্শন করিতে আইসেন, তবে আপনাদের চরণ দর্শন করিতে পাইব। নহিলে এ জীবনে আমার সহিত আপনাদের আর কখন সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। আমি কেন দেশে যাইব না, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।

পুত্র হইয়া জনক-জননীর কিছু করিতে পারিলাম না। কি করিব,—অদৃষ্টের লিখন অন্যরূপ! আমি আপনা-দিগের নিকট বহু অপরাধে অপরাধী; কিন্তু আমার দোষ বড় অধিক নহে।

মাকে আমার এ পত্র দেখাইলে তিনি বড় দুঃখ করিবেন। তাঁহাকে কেবল বলিবেন যে, আমি যাইতে পারিলাম না।

আমার শরীর এখন ভালই আছে।

মধ্যে মধ্যে আমাকে আপনাদের কুশলসংবাদ দিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক

শ্রীভবেশ।

পত্রখানা লিখিয়া, ভবেশ সেখানা পাঠ করিল। বহু দিন পরে তাহার নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিল।

ভবেশ ভাবিল,—কপালে ইহা ছিল! পিতাকে এমন পত্রও লিখিতে হইল! ভবেশ কয়বার পত্রখানা পাঠ করিল। তাহার বোধ হইল, যেন সেখানায় কিছু পরিবর্ত্তন করিলে—একটু কোমল করিয়া ভাবগুলা প্রকাশ করিলে—ভাল হইত। ভবেশ চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শেষে পত্রখানা যেমন ছিল, তেমনই পাঠাইবে স্থির করিয়া রাখিয়া দিল।

তাহার পর ভবেশ ভাবিতে লাগিল,—কই কিছুই হইল না! সে কথা ভুলিতে পারিলাম না। হায়—

"দোষ কারো নহে গো শ্যামা।
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি।"

স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিতে না পারিলে এ যাতনা যাইবে না। কিন্তু সে স্মৃতি কি মুছিবার? প্রাণের সহিত যাহা বিজড়িত, তাহা কি প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন

করা যায়? মানবের জীবনে এত যাতনা কেন—এত মর্ম্মব্যথা কেন? জীবন দুর্ব্বহ ভারমাত্র।

ভবেশ এইরূপ ভাবিতে লাগিল; আর সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাহার হৃদয়ে বঙ্গভূমির ছবি যেন মোহনতম বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। জননী বঙ্গভূমি যেন তাহার পলাতক শিশুকে আপনার শেষ স্নেহ আকর্ষণে প্রাণের পূর্ণ আবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ-দলিতা।

অতুলচন্দ্র চলিয়া গেলে সুধাময়ী কি করিল?

সুধাময়ী বুঝিল,—তাহার আর কোন আশা নাই; সে ভাবিল, এখন মরণই তাহার একমাত্র অবলম্বন।

রাঙ্গাদিদি মধ্যাহ্নে তাহার কক্ষে আসিয়া দেখিলেন,—সুধাময়ী গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি দেখিলেন, তিনি যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, সে তাহা জানিতেও পারে নাই। তিনি সুধার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিলেন। সুধাময়ী চমকিয়া উঠিল। রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "কিলো! শ্যামের বিরহে বিরহিণী রাধা যে আর প্রাণে বাঁচে না?"

এই সময় বিনোদিনী ও সুভাষিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "এই যে তোরা সব সখীরা এসেছিস্! দুটো কৃষ্ণকথা বল্। বিরহিণী রাধা বুঝি কৃষ্ণবিরহে আর প্রাণে বাঁচে না।"

সুভাষিণী বলিল, "কি রাঙ্গাদিদি, কি বলিতেছ?"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "এই আর কি—'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা!' এখন তোরা এক জন গিয়া নাতজামাইকে বলিয়া আয়—

"আছয়ে শ্বাস, না রহে জীব।
বিলম্ব না কর, আমার দিব।"

জামাই না আসিলে ত এ ব্যাধি ঘুচিবে না। সে শ্রী-অঙ্গের বাতাস গায়ে লাগিলেই সব ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে।"

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, "তা, যতক্ষণ শ্যাম না আসেন, ততক্ষণ কালোরূপ দেখিলে যদি রাধার যাতনার উপশম হয়, তবে, রাঙ্গাদিদি, তুমি কাছে থাকিতে তাহার আর কোনও ভাবনাই নাই।"

সুধাময়ী কোন কথা কহিল না, কেবল হর্ম্ম্যতলবদ্ধ-দৃষ্টি নয়নদ্বয় তুলিয়া এক বার রাঙ্গাদিদির দিকে চাহিল।

রাঙ্গাদিদি স্তম্ভিতা হইলেন—একি! এক দিনে একি পরিবর্ত্তন!—না জানি সুধার কি হইয়াছে!

রাঙ্গাদিদির হৃদয় বড় কোমল,—বড় অল্পে ব্যথিত হয়। তিনি ভাবিলেন,—ছিঃ, না বুঝিয়া, না দেখিয়া, অসময়ে ঠাট্টা করিয়া ভাল করি নাই। একি দম্পতী-কলহ! এ বয়সে সে ত নিত্য আসে যায়; তাহাতে কি এমন হয়? তবে এ কি?

সুধাময়ীকে দেখিলে বোধ হয়, কে যেন তাহাকে শ্মশান হইতে তুলিয়া আনিয়াছে। যেন এক দিনে সে যৌবনের লাবণ্য হারাইয়াছে। তাহার কালিমা-বেষ্টিত—কোটরগত নয়নদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহার মুখে যেন আসন্ন মরণের গভীর ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রাঙ্গাদিদি ভাবিলেন,—একি!

বিনোদিনীর ও সুভাষিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সুধাময়ী তাস খেলিতে বসিল। রাঙ্গাদিদি সুধাময়ীর 'খেড়' হইলেন। রাঙ্গাদিদির 'পিঠে'র কাগজ হইতে তাস চুরি হইতে হাতের কাগজ বদলান পর্য্যন্ত নানা চাতুরী সত্ত্বেও, তাঁহাদের উপর্য্যুপরি ছয় বার হার হইল। সুধাময়ী কি দিতে কি দিতেছিল; তাহার তাহাও হুঁস ছিল না।

তাহার পর সুধাময়ী বলিল, "থাক্। আজ আর না। আমার অসুখ করিতেছে।"

বিনোদিনী বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "কেন লো, হয়েছে কি? এত কথা যে, সারারাত্রি একটু ঘুমাতে পারিস্ নি?"

দুই ভগিনীতে একটু হাসাহাসি হইয়া গেল।

সুধাময়ী ম্লানহাসি হাসিল। সে হাসি প্রাণের হাঁসি নহে, সে জোর করিয়া হাসা। সে ম্লানহাসি অশ্রু অপেক্ষাও যাতনার,- তাহার যাতনা বড় তীব্র। বিনোদিনী ও সুভাষিণী তাহা বুঝিল না; কিন্তু রাঙ্গাদিদি বুঝিলেন,—এ হাসি হাসি নহে—যাতনা।

বিনোদিনী ও সুভাষিণী দুই ভগিনী উঠিল। বিনোদিনী রাঙ্গাদিদিকে বলিল, "রাঙ্গাদিদি, চল—আমাদের বাড়ী যাবে।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "তোরা যা। আমি একটু পরে যাইতেছি। এখন কি আর তোদের মত বয়স আছে, দিদি, যে তিন লাফে যাতায়াত করিব? এখন এক জায়গায় বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। আর, যে কাটফাটা রৌদ্র। গায় যেন আগুনের সেঁকা দিতেছে।"

বিনোদিনী ও সুভাষিণী গৃহাভিমুখে গমনের উদ্যোগ করিল। রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "ওরে, মাথায় ভাল করিয়া কাপড় টানিয়া দিস্। যে রৌদ্র! মাথায় রৌদ্র লাগিলে, এখনই মাথা ধরিবে।"

সুভাষিণী বলিল, "আচ্ছা। কিন্তু বাড়ী যাইবার সময় আমাদের বাড়ী হইয়া যাইও।"

রাঙ্গাদিদি বলিল, "ভুলিব না রে, ভুলিব না। বয়স এখনও বাহাত্তর বৎসর হয় নাই।"

হাসিতে হাসিতে বিনোদিনী বলিল, "আর বাকিই বা কি?"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "না, তার এখনও দুই দিকেই অনেক বাকি। সে জন্য ভাবিস্ না।"

দুই ভগিনী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

রাঙ্গাদিদি সুধাময়ীকে বলিলেন, "এ কি, দিদি,—এক দিনে এমন হইয়াছ কেন? কি হইয়াছে? কাহা-

কেও না বলিলে, মনের ভার কমে না, দিদি। তোর কি হইয়াছে, আমাকে বল্।”

সুধাময়ী কিছু বলিল না।

রাঙ্গাদিদি আবার বলিলেন, “দিদি, তুই বড় ব্যথা পাইয়াছিস্। কি হইয়াছে, বল্। তোদের কষ্ট দেখিলে আমার যে কি কষ্ট হয়, তাহা বলিতে পারি না, আমার ছেলে মেয়ে কিছুই নাই,—তোদের লইয়াই আমি সময় কাটাই ;—তোদের চাঁদমুখ দেখিলে আমি সব কষ্ট ভুলিয়া যাই। আমি আপনিই সময় সময় ভাবি, কেন তোদের এত ভালবাসি ? ভগবান যাহার কপালে সুখ লেখেন নাই, তাহার আর মায়া বাড়ান কেন ? এই দ্বিপ্রহরে বাড়ী বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে,—যেন হানাবাড়ীর মত বোধ হয় ; আমার মন কেমন করিয়া উঠে, তোদের না দেখিয়া থাকিতে পারি না। এই বিনী কয় দিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাইবে, আমার কেমন কষ্ট বোধ হইতেছে। আমার কি পেটের কিছু আছে ?”

সুধাময়ী বলিল, “রাঙ্গাদিদি, তুমি যে আমাদের কত ভালবাস, তাহা কি আমরা জানি না ?”

বাস্তবিক, রাঙ্গাদিদির কথায় সুধাময়ীর চক্ষে জল আসিতেছিল। প্রকৃত সহানুভূতির নিকট, প্রকৃত ভালবাসার নিকট কি লুকোচুরি করিতে ইচ্ছা করে ?

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "দিদি, কি হইয়াছে?"

সুধাময়ী বিপদে পড়িল, বলিল, "এমন কিছু নহে। তিনি আমার উপর রাগ করিয়াছেন।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "ভাবিস্ না, দিদি! পুরুষের রাগ দুই দিনে যাইবে। আমরা পোড়ারমুখীরাই রাগ করিয়া থাকিতে পারি; পুরুষের রাগ অধিক দিন থাকে না। তাহাদের ভালবাসা সত্যসত্যই ভালবাসা, আমাদের ভালবাসা তেমন নহে।"

সুধাময়ী ভাবিল,—বাস্তবিক তাঁহাদের ভালবাসাই ভালবাসা; আমাদের ভালবাসা তেমন নহে।

রাঙ্গাদিদি আবার বলিলেন, "সে জন্য ভাবিস্ না, দিদি! সে রাগ থাকিবে না। স্ত্রীর উপর রাগ করিলে, স্বামীর নিজের যত কষ্ট হয়, স্ত্রীর তত কষ্ট হয় না। স্ত্রীকে স্বামী যত ভালবাসেন, স্ত্রী কি স্বামীকে তত ভালবাসে?"

সুধাময়ী বলিল, "সত্য কথা, রাঙ্গাদিদি।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন, "দিদি, যদি দোষ করিয়াছিলি, তবে তখনই পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিস্ নাই কেন? স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে স্ত্রীর অপমান কি? স্বামী আমাদের জগতে দেবতা;—আমরা তাঁহাদিগের সেবিকামাত্র।"

সুধাময়ী কিছু বলিল না।

তাহার পর নানাপ্রকারে সুধাকে আশ্বাস দিয়া রাঙ্গা-দিদি বিদায় লইলেন।

রাঙ্গাদিদি চলিয়া গেলে, সুধাময়ী ভাবিতে বসিল। তাহার কক্ষের পশ্চাতে পানাপুকুরের তীরে একটা গাছে একটা পাখী ডাকিতেছিল,—"বৌ, কথা কও।" আর পাড়ার কতকগুলি দুষ্ট ছেলে, সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেই পাখীটাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহা দেখিয়া, কক্ষের বাতায়ন হইতে সুধাময়ীর ছোট ভাইটি হাততালি দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"ধল্লে—ধল্লে!" পাখী উড়িয়া গেল,—কলরব করিতে করিতে ছেলেরা চলিয়া গেল।

সুধাময়ী ভাবিতে লাগিল,—এখন আর উপায় কি? মরণ ভিন্ন এখন আমার আর কি উপায়? সকল আশা ত স্বপ্নে পরিণত হইল; তিনি ত চরণে স্থান দিলেন না। এখন কি করি? এত দিন ভাবিয়াছিলাম, সন্তানের মুখ দেখিলে তাঁহার দয়া হইবে। এখন দেখিতেছি, স্নেহ-বন্ধনও তাঁহাকে বাধিতে পারিল না। আমি যে কি কষ্ট পাইয়াছি, তাহা তিনি বুঝিলেন না। আমি যে কিরূপ অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছি, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি যে তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিয়াছি, তাহাও তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি পাপীয়সী; আমি আমার পাপের ফল পাইতেছি। কিন্তু

এ যাতনা আর কত দিন সহিব;—হায়, কেমন করিয়া সহিব? আর ঐ শিশু—

সুধাময়ী সন্তানের দিকে চাহিল। শিশু ঘুমাইতেছিল।

সুধাময়ী ভাবিল,—আমার মত যাতনা সহিতে, আমাকে অভিসম্পাত করিতে, জনকের গৃহে অপমানিত হইতে কি উহাকে রাখিয়া যাইব? উহার পিতা ত উহাকে সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলেন না! আমি গেলে উহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব? উহাকেও লইয়া যাইব।

সুধাময়ী আপনার চিন্তায় আপনি শিহরিয়া উঠিল। ঐ শিশু—আপনার প্রাণের প্রাণ—আপনার দেহ দিয়া সে যাহার দেহ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাকে—! সে কেমন করিয়া তাহা করিবে! কিন্তু তাহা ছাড়া আর উপায় কি?

আজ সে কথা ভাবিয়া, তাহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রুও আসিল না; যাতনার তীব্র তাপে তাহার অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার নয়ন অশ্রুহীন।

তাহার পর উঠিয়া, বাক্স খুলিয়া, সুধাময়ী একটি টাকা বাহির করিল। ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "আমাকে এক টাকার আফিম আনিয়া দাও।"

ঝি বলিল, "সে কি! তুমি এক টাকার আফিম কি করিবে? আমি আনিয়া দিতে পারিব না।"

সুধাময়ী কঠোর স্বরে বলিল, "আমার দরকার আছে; তোর তাহাতে কি? কথা না শুনিবি ত দূর করিয়া দিব।"

ঝি বলিল, "যাহা করিতে হয় করিও। আমি পারিব না। আমি এ কথা মা-ঠাকুরাণীকে বলিয়া দিতেছি।"

সুধাময়ী বুঝিল,—ভয় দেখাইয়া ঝিকে দিয়া কাজ লওয়া অসম্ভব। বরং তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবে। সে তাহার মাতাকে বলিয়া দিলে, তিনি সর্ব্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন। সুধাময়ী আর এক উপায় অবলম্বন করিল। বাক্স হইতে আর পাঁচটি টাকা লইয়া, সে ঝির হাতে দিয়া বলিল, "এই লইয়া যা। আনিয়া দিলে, আমার হাতের এই আট ভরীর বালা দিব।"

ঝি এইবার কিছু বিপদে পড়িল। এত টাকা! আট ভরীতে আট কুড়ি টাকা। কে দেখিবে,--কে জানিবে? সে টাকা লইয়া, বৃন্দাবনে যাইয়া 'ভেক' লইলেই বা ক্ষতি কি? এ পোড়া চাকরী, এ ছাই সকলের গালি আর কত সহ্য করা যায়? হাজার হউক, মানুষের শরীর ত বটে! ঝি একটু ইতস্ততঃ করিল।

সুধাময়ী বলিল, "যাইবি কি না, বল্।"

তত্ক্ষণে ঝির কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছিল। অঞ্চলে টাকা কয়টি বাঁধিয়া, বৈষ্ণবী হইবার সময় সে কতগুলি

বৈষ্ণবকে 'মচ্ছব' দিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে অহিফেন কিনিতে চলিয়া গেল।

সুধাময়ী বাক্স খুলিয়া, কয়খানা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া পত্র লিখিতে বসিল। সে একবার কি ভাবিল, তাহার পর আপনা-আপনি বলিল,—"আর ছাই ভাবিয়া কি করিব? জলে ঝাঁপ দিবার সময় আর কূলের দিকে চাহিয়া কি ফল লাভ করিব? কপালে যাহা ছিল, হইল। অদৃষ্টের সহিত ঝগড়া করিয়া, আর ফল কি? আমার আর উপায় নাই।" আজ মরণের কূলে দাঁড়াইয়া, সুধাময়ী জীবনের প্রতি একটা মমতা, একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সুধাময়ী পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। অল্প লিখিতেই ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। সে উঠিয়া গিয়া, পুত্রকে কোলে লইল। ছেলে শান্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সুধাময়ী আবার পত্র লিখিতে বসিল।

সুধাময়ী লিখিতে লাগিল। সে অনেক কথা লিখিল,—বহুক্ষণ ধরিয়া লিখিল। তাহার পর পত্রখানা একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, সে সেখানা খামে আঁটিয়া, খামের উপর অতুলচন্দ্রের নাম ও ঠিকানা লিখিল। এমন সময় ঝি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধা-

ময়ী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাহার নিকট হইতে অহিফেন লইল; যেন সে তাহার নিকট হইতে অমৃতভাণ্ড কাড়িয়া লইল। তাহার পর অতুলচন্দ্রকে লিখিত পত্রখানা ঝির হাতে দিয়া, সুধাময়ী বলিল, "এখানা চাকরদের কাহাকেও দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দে।"

ঝি বলিল, "কই—আমার বালা?" তাহার সন্দেহ হইয়াছিল,—বুঝি, সুধাময়ী তাহাকে ফাঁকি দিবে।

সুধাময়ীর এক প্রকোষ্ঠে সধবার 'লৌহ' ও বলয়, অপর প্রকোষ্ঠে কেবল বলয়। যে প্রকোষ্ঠে কেবল বলয়, সুধাময়ী বাহু হইতে তাগা সেই প্রকোষ্ঠে নামাইল;—সধবাকে প্রকোষ্ঠ শূন্য রাখিতে নাই—তাহার পর দুইগাছি বলয় খুলিয়া দাসীকে দিল। দাসী বলয় লুকাইতে দ্রুতগতি নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। তখন সুধাময়ী অলঙ্কারের বাক্স খুলিয়া অহিফেন রাখিল ও ঝাঁকচুড়ী বাহির করিয়া পরিল। সুধাময়ী সুখসুপ্ত সন্তানের মুখচুম্বন করিল। শিশু জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—সুধাময়ী তাহাকে ক্রোড়ে লইল।

শিশু ক্রন্দনে বিরত হইতে না হইতেই, সুধাময়ীর জননী সেই কক্ষে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "খোকাকে আমার কাছে দিয়া কাপড় কাচিয়া আয়।" মার কাছে ছেলে দিয়া, সুধাময়ী সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অভাগিনী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দিন রাত্রিকালে, সুধাময়ীর কক্ষে তাহার শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া, সুধার জননী ভাবিলেন, বুঝি সুধাময়ী ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহার কক্ষের দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন। দ্বার রুদ্ধ। তিনি কয়বার ডাকিলেন,—সুধাময়ী উত্তর দিল না।

কক্ষের আর একটি দ্বার ছিল। সে দ্বার সাধারণতঃ অপর কক্ষ হইতে বদ্ধ থাকিত। সেই দ্বারের কাছে আসিয়া, সুধাময়ীর জননী কক্ষমধ্যে এক প্রকার অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি স্বামীকে ডাকিলেন।

সে দ্বারও রুদ্ধ! কর্ত্তা দ্বারে পদাঘাত করিলেন,—দ্বার খুলিয়া গেল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই গৃহিণী চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"ওমা সুধা—রে সুধা!"

কর্ত্তা গৃহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "কি কর! কি কর! জানাজানি হইবে।"

গৃহিণী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুধাময়ী শয্যায় পড়িয়া আছে। চক্ষু যেন কপালে উঠিতেছে। পার্শ্বেই একটা পাত্র—পাত্রে তৈলমিশ্রিত

অহিফেনের অবশেষ পড়িয়া আছে। দেখিয়াই কর্ত্তা বুঝিলেন—কি হইয়াছে। তিনি ডাকিলেন, "সুধা,—মা!"

সুধাময়ীর ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল; সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথা ফুটিল না। যে দিকে তাহার শিশু ছিল, সে সেই দিকে দেখাইবার চেষ্টা করিল। কর্ত্তা বুঝিলেন, সে কি চাহিতেছে। তিনি বলিলেন, "মা, এ কাজ কেন করিলি?"

সুধাময়ী আবার সেই দিকে দেখাইবার চেষ্টা করিল।

কর্ত্তা সুধাময়ীর রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া আসিলেন,—বলিলেন, "এই যে, মা, তোর ছেলে।"

তখন সুধাময়ীর আর জ্ঞান নাই। অসহনীয় যাতনায় সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল; তাহার মুখে আরও ফেনা উঠিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহার বড় যাতনা হইতেছে। কয়বার শয্যায় ছট্ ফট্ করিয়া সুধাময়ী নিশ্চল হইল;—তাহার চক্ষু স্থির হইল।

তখন তাহার মুখ দেখিলে ভয় হয়—চক্ষু দুইটি অসম্ভব বড় বোধ হইতেছে—আর সেই নিশ্চল নয়নের দৃষ্টি! দন্তে দন্ত লাগিয়াছে! শয্যার উপর তাহার কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর সেই বিশৃঙ্খল কেশজালের মধ্যে তাহার সেই বিকৃত ভীষণ-দর্শন মুখ!

কর্ত্তারও কেমন বোধ হইল। গৃহিণী আবার দ্বিগুণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

এ জগতে সুধাময়ীর সকল জ্বালা জুড়াইল।

কন্যা আত্মহত্যা করিলে, পিতামাতার কাঁদিয়া যাতনা লাঘব করিবার সুযোগও থাকে না। কেবল আশঙ্কা;—জানাজানি হইলে 'লাশ' পরীক্ষা হইবে; ভদ্র-ঘরের মেয়ের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিয়া, পরীক্ষা করা হইবে।—লোকলজ্জার আর সীমা থাকিবে না। শোকের অপেক্ষাও সে লজ্জার আশঙ্কা অধিক;—বেদনার অপে-ক্ষাও লোকলজ্জার নিষ্ঠুর দংশন অধিকতর কষ্টকর। বংশের সে কলঙ্ক-কাহিনীর জনশ্রুতি বহুদিন ঘোষিত হইতে থাকিবে, বংশের সে অপযশ শীঘ্র অপনীত হইবে না। সে বড় লজ্জা;—সে বড় আশঙ্কা।

চক্ষের জল চক্ষে শুকাইয়া,—প্রাণের বেদনা উপ-শমিত হইবার পূর্ব্বেই, সুধাময়ীর পিতাকে কন্যার দেহ-সৎকারের আয়োজন করিতে হইল। সকল আয়োজন করিয়া, কর্ত্তা রাত্রির মধ্যেই শ্মশানে কন্যার শবদেহ ভস্মীভূত করিয়া আসিলেন। কন্যার মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া, হতভাগ্য পিতা যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন পূর্ব্ব গগনে মেঘমালার উপর ঊষার অরুণরাগ ছড়াইয়া পড়িতেছে—জীবজগৎ জাগিয়া উঠিতেছে।

কর্ত্তা যখন ফিরিয়া আসিলেন, গৃহিণী তখনও মেজেয় পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া গৃহিণী আর থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—“মা সুধা!”

সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; শুনিলেন, বিসূচিকায় সুধাময়ীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, সুধাময়ীর মাতা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিনোদিনী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা রমণীগণ দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনোদিনীর জননী, রাঙ্গাদিদি প্রভৃতি ধরাধরি করিয়া, গৃহিণীকে উঠাইয়া বসাইলেন। জননীর বেদনা আর কে বুঝিবে? সন্তানের শোকে জননী যে অশ্রুবর্ষণ করেন, তাহাতে যে যাতনা, যে মর্ম্মব্যথা, তাহা কি কেহ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে?

রাঙ্গাদিদি সুধাময়ীর শিশুকে গৃহিণীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, “এ সময় তুমি এমন হইলে, এ শিশুর দশা কি হইবে! যাহা হইবার হইয়া গেল। অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাইবে? এখন তুমি শান্ত না হইলে এ গুঁড়াকে মানুষ করিবে?”

গৃহিণী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহার বিন্দু বিন্দু অশ্রু সেই ক্রোড়শয়ান শিশুর দেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

তাহার পর সকলে ধরিয়া, গৃহিণীকে স্নান করাইয়া আনিলেন।

গৃহিণীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, মহিলাগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনিচ্ছাস্বত্বেও রাঙ্গাদিদিকে গৃহকার্য্যের জন্য গৃহে যাইতে হইল। তিনি বড় ব্যথা পাইলেন। গৃহে যাইয়াই তিনি চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে কেমন একটু সন্দেহ রহিয়া গেল। সুধাময়ীর সেই ম্লানমুখ তাঁহার মনে পড়িল ;—তিনি ভাবিলেন, সত্যই কি সুধা বিসূচিকায় মরিয়াছে?

সুধাময়ী ভাবিয়াছিল,—সে সন্তানকেও বিষপান করাইবে ; কিন্তু শিশুর মুখের কাছে বিষের বাটী লইয়া গিয়া, সে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল। জীবনে শেষবার তাহার নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়াছিল, সেই অশ্রুস্রোতে তাহার সকল সঙ্কল্প ভাসিয়া গিয়াছিল। সে আপনা-আপনি বলিয়াছিল,—"না, তাহা পারিব না। তিনি যাহাই বলুন, এ তাঁহারই সন্তান। আমি কেন তাঁহার সন্তানকে বধ করিব? গত জন্মে না জানি কত পাপই করিয়াছিলাম, তাই এ জীবনে এমন যাতনা পাইলাম। আবার ত এই পাপ করিতে যাইতেছি—আত্মহত্যা করিতেছি। পাপের

উপর আর পাপ বাড়াইব কেন? পরজন্মের জন্য আবার অনন্তযাতনা সঞ্চিত করিয়া রাখিব কেন? তাহা করিব না।"

সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া, সুধাময়ী স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা করিলে না। তোমার ক্রোধ, তোমার ঘৃণা লইয়া আমি মরিলাম। এ জীবনে তোমাকেও যাতনা দিলাম, আপনিও কেবল যাতনা পাইলাম, পরজন্মে যেন তোমার চরণ-সেবা করিয়া, সর্ব্বপাপ ক্ষয় করিতে পারি—আপনি কৃতার্থ হইতে পারি।"

তাহার পর আবার স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সুধাময়ী বিষের বাটী তুলিয়া বিষপান করিয়াছিল।

নারী-জীবনে যত যাতনা সহ্য করা সম্ভব, তাহা সহিয়া, আর সহিতে না পারিয়া, সুধাময়ী জ্বালা জুড়াইতে চাহিতেছিল। জ্বালা জুড়াইবার অন্য পথ দেখিতে না পাইয়া সে আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার স্বামী ত তাহার অনুতাপের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। কই, তিনি কি তাহার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন? জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে,—হৃদয়ের ঘোর অন্ধকারে সে যাঁহার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়াছিল, তিনি কি একবার ভুলিয়াও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন?

সুধাময়ী যাঁহাকে জীবনের অবলম্বনরূপে অবলম্বন করিয়াছিল, তাঁহার কি তাহার প্রতি কোন কর্ত্তব্যই ছিল না? তিনি তাহার পক্ষে সূর্য্যেরই মত দুর্নিরীক্ষ্য ছিলেন—তাহাই কি তাঁহার উচিত হইয়াছিল? সুধাময়ী জগতে যাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার চরণসেবাই তাহার পক্ষে সকল পুণ্যের আকর—এই কথা সে শৈশব হইতে শিখিয়াছিল, তাহার সেই পতি-দেবতা কি তাহার সহিত ব্যবহারে মানবোচিত দয়া বা দেবোচিত ক্ষমার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চক্রীর চক্র।

পৌষের সন্ধ্যা। পল্লীগ্রামে কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে পল্লীপথে কোথাও কুকুরের চীৎকার শব্দমাত্র শ্রুত হইতেছে। আর শুনা যাইতেছে, গ্রামের পথিপার্শ্বে কতকগুলা ঝাউগাছে পবনের শন্ শন্ শব্দ। নিস্তব্ধ ধূলিময় পল্লীপথে অতুলচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কয় জন প্রজা, এক জন কর্ম্মচারী ও এক জন লণ্ঠনধারী পাইক আসিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র; আমন ধানের শীষগুলি কেবল পাকিয়া উঠিতেছে। শীর্ণকায় চন্দ্র দূরপ্রান্তরের পরপারে একটা বাশঝাড়ের পশ্চাৎ হইতে কেবল উঁকি দিতেছে। সেই ম্লানচন্দ্রালোকে, অদূরস্থ বিলের উপর জলাভূমি প্রেত-ভূমির মত দেখাইতেছে। আকাশে অগণিত তারকার দীপ্তি;—আর ধান্যক্ষেত্রে ধরণীর তারকা খদ্যোতের দীপ্তি। আঁধারে জোনাকী জ্বলিতেছে—নিভিতেছে; আবার জ্বলি-তেছে—আবার নিভিতেছে। অদূরে, জলাভূমিতেও আলেয়ার আলোক জ্বলিতেছে—নিভিতেছে।

অতুলচন্দ্রের হৃদয়েও আশার আলোক জ্বলিতেছে—নিভিতেছে। সে এক জন প্রজাকে বলিল, "কি, আলি-মামুদ, মোকদ্দমা হইলে ঠিক বলিতে পারিবে ত?"

সে বলিল, "হুজুর, তা আর পার্‌বো না? ঐডাই আমারগের ব্যবসা। মুই বলবো,—আমি ক্যান, মোর বড় চাচা ঐ জমি কর্‌তো। তার পরে গ্যান মুই কর্‌চি"। মোর চাচাতো ভাই মলি পর মুই কর্‌চি;—আপনারেই খাজনা দিচ্চি।"

অতুলচন্দ্র আর এক জন প্রজাকে বলিল, "কেমন, সোনাই, তোমার কোন গোল হইবে না ত?"

সে বলিল, "তা হবে না, হুজুর। মুই বল্‌বো,—ঐ জাম গাছটার জাম ত এট্টুক ব্যালা হতি পাড়ছি, আর ধামা ভরে ভরে মুনিব বলি হুজুরের বাড়ী দিয়ে আস্‌ছি। সে কথা অ্যাহেন্‌কার সক্কলেই জানে।"

অতুলচন্দ্র বলিল, "আচ্ছা; ভাল।"

তাহার পর অতুলচন্দ্র আর এক জনকে বলিল, "ছিদাম, দুঃখী কিছু গোল করিবে না ত?"

সে বলিল, "গোল কিসির, হুজুর? আমি তারে বলিছি যে, কুমীরির সঙ্গে বিবাদ করে' কি জলে বাস করা যায়? আপনার সঙ্গে বিবাদ করে ছাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? জমী করা ত জমী করা;—ঘরে আগুন দিলিই বা কে কি কত্তি পারে? তা সে বলে,—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন এই কর্ম্ম করবো,—অধর্ম্ম হবে যে!"

অতুলচন্দ্র বলিল, "বেটার ভারি ধর্ম্ম! ভাল সাক্ষী না দেয়,—তখন দেখা'ব তা'র কোন ধর্ম্মে তা'কে রাখে।"

ছিদাম বলিল, "তা আমি বল্লাম,—তা হলি যে ভেসে য্যাবা! তার পর সে স্বীকার হয়েছে, আর গোল কর্‌বে না। হুজুর, আমি এত কল্লাম, বিলির টেকের উপর ঐ ক' বিঘে ভুঁই কিন্তু আমারে দিতি হবে।"

অতুলচন্দ্র মনে মনে বলিল, "কাজ হইয়া গেলে আর তোমায় দিব!" প্রকাশ্যে সে বলিল, "আচ্ছা। তা' হ'বে।"

তাহার পর অতুলচন্দ্র সোনাইকে বলিল, "সোনাই, তুমি এক ভাঁড় রস পাড়িয়া আন।"

পল্লীগ্রামে খেজুর-রস প্রায় চাহিলেই পাওয়া যায়। পল্লীবাসীরা সকল সময় রস বলিয়া লওয়াও আবশ্যক মনে করে না। ভাঁড় খুলিয়া রস খাইয়া, আবার ভাঁড় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। ইহা অবশ্য পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়া—সুতরাং আইনতঃ চুরী করা। কিন্তু সুখের বিষয়, গাছের স্বত্বাধিকারী বা "অপহারক", কেহই ইহা অপরাধ বিবেচনা করে না। সারারাত্রি মাঠ চৌকি দেওয়া অসম্ভব, তাই যাহার গাছ অল্প, বা যে অপরকে সামান্য রস দিতেও অনিচ্ছুক, সে ভাঁড়ের মধ্যে

কচু বা তজ্জাতীয় অন্য কোন উদ্ভিদাংশ রাখিয়া যায়। সেই ভাঁড়ের রস পান করিলে মুখ "ধরে"—অর্থাৎ কুট্‌কুট্‌ করে।

সোনাই রস আনিতে গেল।

গৃহে গিয়া, প্রজাদিগকে আবার একবার সব শিখাইয়া, অতুলচন্দ্র বাক্স খুলিয়া তাহাদিগকে দাখিলা দিল। বলা বাহুল্য, ইহা জাল দাখিলা।

দাখিলা লইয়া প্রজারা চলিয়া গেল।

অতুলচন্দ্র একটা বড় রকম ষড়যন্ত্র করিতেছিল। অতুলচন্দ্রের অল্প কিছু জমাজমী ছিল। তাহার জমী ও অপর এক জমীদারের জমী, এতদুভয়ের মধ্যে একটা বিল ছিল। এখন বিল শুষ্ক—কেবল বর্ষায় একটু জল জমে; তখন ঝাঁকে ঝাঁকে জলচর পক্ষী সেখানে আইসে—তাহাদের বিরাবে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠে। তাহার পর শরৎকাল যাইতে না যাইতে জল শুকাইয়া, মাটি ফাটিয়া, ফুটিফাটা হইয়া উঠে। সেখানে যে জমী 'উঠিৎ' হইয়াছে, সেই আমনধানের জমীর কর অধিক। বিলটা অপর জমীদারেরই ছিল। এখন অতুলচন্দ্র সেই জমী দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতুলচন্দ্র সে অঞ্চলের একজন পাকা জালিয়াৎ আনাইয়া, ঐ জমী চিঠা-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর সেই চিঠা চাউলের হাঁড়িতে রাখিয়া পুরাতন করিয়াছিল।

প্রজাদিগকে বশ করা সহজেই সম্পন্ন হইল। প্রজা যাহার জমীতে বাস করে, কখনও তাহার কথা অমান্য করিতে সাহস করে না। তাহার পর প্রলোভন; দরিদ্রের পক্ষে প্রলোভনসংবরণ প্রায়ই সহজসাধ্য নহে। কোন প্রজাকে জমী দিবে বলিয়া, কাহাকেও জমায় "কমি দিবে বলিয়া, কাহাকেও বা সেলামী না লইয়া জমা দিবে আশা দিয়া, অতুলচন্দ্র কাজ লইতেছিল। এখানে বলিয়া রাখি—কার্য্যোদ্ধার হইলে যে সে আপনার কথা রক্ষা করিত, এমন নহে। প্রজাদিগের মধ্যে এক দুঃখী শেখ কিছু গোল করিয়াছিল। দুঃখীর বয়স তিন কুড়ীর উপর গিয়াছে। সে মিথ্যা কথাটা বলিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু দরিদ্রকে ভয় দেখান বড় কঠিন কাজ নহে। অতুলচন্দ্র ভয় দেখাইল যে, তাহার আবশ্যকমত সাক্ষ্য না দিলে, তাহাকে পরিবারবর্গ লইয়া, এই বৃদ্ধ বয়সে পথে দাঁড়াইতে হইবে। একটা কথা,—ক্ষুদ্র কথা,—তাহাতে তাহার আপত্তি কি? শেষে বাধ্য হইয়া, বৃদ্ধ সজলনয়নে স্বীকার করিল; মনে মনে বলিল, "খোদা, তুমিই জান—কি দায়ে পড়িয়া আমি এ পাপ করিতে যাইতেছি।"

অতুলচন্দ্রের আয়োজনের ত্রুটি হইল না। সে প্রজাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দাখিলা দিল। তাহারা

বলিবে যে, তাহারা পূর্ব্ব হইতে তাহাকেই খাজনা দিয়া আসিতেছে; অপর জমীদারের কোন তোয়াক্কা রাখে না।

এখন এরূপ কোন পাপেই আর অতুলচন্দ্রের আপত্তি নাই। স্বার্থের জন্য সে সবই করিতে প্রস্তুত। তাহার উপর, তাহার এই অধঃপতন দ্রুত করিয়া দিবার আরও একটা কারণ ছিল—সেটা সুধাময়ীর ব্যবহার।

অতুলচন্দ্র ভাবিয়াছিল,—"জগতে সুখ পাইলাম না। সুখ চাহিয়া দুঃখ পাইলাম; প্রেমের পরিবর্ত্তে যাতনা পাইলাম; যাহা চাহিলাম, তাহার বিপরীত পাইলাম। জগৎ যখন আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, তখন আমি কেন সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিব? যেরূপে পারি, আত্ম-তৃপ্তির উপায় দেখিব। পাপের উত্তেজনাতেই হউক, আর যাহাতেই হউক, আপনাকে একটু আনন্দদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

মানবের মনের এ অবস্থা বড় ভীষণ। এ অবস্থায় মানব পশুর অপেক্ষাও অধম হয়। পশু সহজাত-সংস্কার বশে সে কার্য্য করে; মানব বিবেক বিনষ্ট করে, কিন্তু তাহার সহজাত-সংস্কার নাই। তাই এ অবস্থায় মানব পশুর অপেক্ষাও হীন হইয়া উঠে।

অতুলচন্দ্র জগতের উপর প্রতিহিংসা লইতে কৃত-

সঙ্কল্প হইয়াছিল। সে বুঝে নাই যে, সে আপনারই সর্ব্ব-নাশ করিতেছিল,—সে আপনিই মনুষ্যত্ব হারাইতেছিল। সে কোন পথে যাইতেছিল, তাহা দেখে নাই; দেখিলে হয় ত সে একবার ভাবিত। সে ক্রোধে, অপমানে, অন্ধ হইয়াছিল; তাই একবার দেখেও নাই যে, সে স্বয়ং অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুধাময়ীর পত্র।

পৌষের প্রভাত। কুজ্ঝটিকার যবনিকা অপসারিত করিয়া, সূর্য্যের উপভোগযোগ্য মধুর কিরণ কেবল জলে স্থলে নির্ম্মল হাস্য বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। দোহনান্তর গরুর পাল লইয়া, রাখালবালক মাঠে যাইতেছে। তাহার গাত্রে একখানি ছিন্ন কন্থা;—এক হস্তে পাঁচনি, অপর হস্তে একটা থেলো হুঁকা। এখনও পল্লীপথে কোন কোন রমণী পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া, ঘাট হইতে গৃহে ফিরিতেছেন। পল্লীর প্রায় সকল গৃহ হইতেই উনানের ধূম আকাশে উঠিয়া, রন্ধনের আয়োজনের পরিচয় দিতেছে। একটা সজিনাগাছের ডালে বসিয়া, কয়টা বায়স বড়ই কলরব করিতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপে একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া, অতুলচন্দ্র একজন প্রজার একখানা খত পরীক্ষা করিতেছে। চিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে বীরবর পবন-নন্দনকে যেরূপে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, প্রজাটি সেইরূপে 'বাবুর' পদপ্রান্তে বসিয়া আছে। সেই বলিষ্ঠকায়—সুগঠিত-দেহ পুরুষটি নিতান্তই নিরীহবৎ করুণনেত্রে অতুলচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া আছে।

এই কৃষক অতুলচন্দ্রের নিকট কিছু ধান্য ঋণ

লইয়াছিল। সুদে আসলে অতুলচন্দ্রের প্রাপ্য এখন তাহার প্রদত্ত ধান্যের দ্বিগুণ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। সে হতভাগ্যের এমন সাধ্য নাই যে, সে তাহা পরিশোধ করে। তাই সে বাবুর কৃপাভিখারী হইয়া আসিয়াছে।

খত দেখিয়া অতুলচন্দ্র বলিল, "ইহার আর কোন উপায় নাই; দুই দিনের মধ্যে প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে নালিশ হইবে।"

কৃষক অতুলচন্দ্রের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

অতুলচন্দ্র বলিল, "বাপু, আমি কি করিব? টাকাগুলা ত আর জলে ফেলিয়া দিতে পারি না!"

কৃষক কাঁদিতে লাগিল।

শেষে স্থির হইল যে, সে এখন অর্দ্ধেক পাওনা মিটাইয়া দিবে; অবশিষ্ট পাওনা (অবশ্য আবার সুদের সুদ লইয়া) কয় মাস পরে দিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে একটা 'লোকসানি' জমা 'বাকি বকেয়া' দিয়া লইতে হইবে। সেও মন্দের ভাল ভাবিয়া, সে স্বীকার করিল। তাহাতে তবুও কিছু সময় পাওয়া যাইবে; তখন অদৃষ্টে যাহা থাকে ঘটিবে।

অতুলচন্দ্র ডাকিল, "হরিনাথ!"

কাছারী-ঘর হইতে মুহুরী বাহির হইয়া আসিল।

অধঃপতন।

অতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "লোকেরা কতক্ষণ গিয়াছে ?"

মুহুরী বলিল, "ভোরেই গিয়াছে।"

অতুলচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কয় জন ?"

মুহুরী বলিল, "সাত জন।"

অতুলচন্দ্র বলিল, "আচ্ছা।"

মুহুরী চলিয়া গেল।

যে বিলেন জমী আত্মসাৎ করিবার জন্য অতুলচন্দ্র এত চেষ্টা করিতেছিল, সেই জমীতে এক জন প্রজা ধান কাটিবে। অপর জমীদারের লোকের বাধা দিবার সম্ভাবনা ছিল। সেই জন্য আপনার প্রজার সাহায্যার্থ অতুলচন্দ্র লোক পাঠাইয়াছিল।

অতুলচন্দ্র বসিয়া রহিল। ক্রমে বেলা একটু বাড়িল। এমন সময় গ্রামের ডাক-পিয়ন আসিয়া উপস্থিত হইল। একহাঁটু ধূলি, গাত্রে একখানা মলিন বালাপোষ। সে আসিয়া অতুলচন্দ্রকে একখানা পত্র দিয়া, অন্য পত্রগুলা বিলি করিতে চলিয়া গেল।

পত্রখানার হাঁতের লেখা বড়ই পরিচিত। অতুলচন্দ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল; তাহার 'পর পত্রখানা খুলিল। পত্রখানা সুধাময়ীর লেখা। অতুলচন্দ্র যতই পড়িতে লাগিল, তাহার নয়নদ্বয় ততই বিস্ময়-বিস্ফারিত হইতে লাগিল।

সুধাময়ী লিখিয়াছে ;—

প্রিয়তম,

তুমি যাহাকে চরণে স্থান দিলে না, তাহার এই শেষ পত্র একবার পড়িও। তুমি আমাকে বলিবার অবকাশ দাও নাই, তাই আমি আমার জীবনের সব কথা বলিতে পারি নাই। আজ আমি আর কিছু গোপন করিব না; আজ মরণের কূলে দাঁড়াইয়া হৃদয়ের ভার নামাইব। যখন তুমি এই পত্র পাইবে, তখন আমি আর বাঁচিয়া থাকিব না; আমি আজই মরিব। মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে সকল কথা বলিব। তুমি আমাকে চরণে স্থান দাও নাই। কিন্তু তোমার চরণে ভিন্ন আমার আর স্থান কোথায়? তাই তোমারই চরণে আজ সব কথা বলিব।

আমাব দাদা কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন। একবার পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া তাঁহার জ্বর হইল। কিছু দিন চিকিৎসায় জ্বর বন্ধ হইল; কিন্তু শরীর সবল হইল না; তিনি ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। ছুটীর শেষে দাদা কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। দিনকতক পরে আমরা সংবাদ পাইলাম,—দাদার অসুখ।

বাবা কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। তাহার পর একদিন আমার পিস্‌তুতো ভাই আসিলেন; তিনি কলিকাতায় কি কার্য্য করি-

তেন। বাবা আমাদের কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা আমাদের লইয়া তাঁহার সহিত কলিকাতায় রওনা হইলেন।

পরদিন কলিকাতায় পহুঁছিয়া দেখিলাম—দাদা আর উঠিতেও পারেন না,—যেন শয্যার সহিত মিশাইয়া গিয়াছেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন। দাদা তাঁহাকে কত বুঝাইতেন,—কত সান্ত্বনা দিতেন; কিন্তু মার মন কিছুতেই বুঝিত না, কিছুতেই শান্ত হইত না। মা কেবল কাঁদিতেন।

বাবা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া দাদার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আর আমরা প্রাণপণ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

সেই সময় দাদার একজন সহপাঠী নিত্যই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ নানা কথায় দাদা একটু প্রফুল্ল থাকিতেন। তিনি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই বিপদের সময় তিনি আমাদিগের সহিত নিতান্ত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতেন; আমরাও তাঁহাকে স্বজনের মত দেখিতাম। দাদার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হয়। মৃত্যু-শয্যায় দাদা তাঁহার নিকটে সে প্রস্তাবও করিয়াছিলেন।

সেই রোগ-ক্লিষ্ট দাদার শয্যাপার্শ্বে তাঁহার সহিত আমার প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হইত। দাদা তাঁহার কে?—সহপাঠিমাত্র। দাদার ত আরও কত সহপাঠী আছেন, কই—তাঁহারা কেহ ত একবারও তাঁহাকে দেখিতে আসেন না! আর ইনি—লোকে ভ্রাতাকে যত না করে, দাদাকে তত করিতেছেন! তাঁহার মহত্ত্ব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার সদ্‌গুণ আমার বালিকা-হৃদয়ে প্রভাব সংস্থাপন করিতেছিল।

দাদা রোগে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। আমাদিগের সংসারে যেন কেমন একটা বিষাদের ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; গৃহে সকলেই বিষণ্ণ,—বিশেষ বাবার ও মার মুখে হাসি দেখিতে পাইতাম না। কেবল তিনি আসিলে, দাদার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। সেই বিষাদের মধ্যে আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। ক্রমে আমি তাঁহার আগমনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে বাবা আমাকে পড়াইতেন। আমরা কলিকাতায় আসিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি পড়ান বন্ধ করিয়াছিলেন; বলিতেন,—"মোটামুটি যাহা শিখিয়াছে, তাই যথেষ্ট; আর আবশ্যক কি?" দাদার ইচ্ছা ছিল, আমি আরও পড়ি। তিনি যখনই দেশে যাইতেন, তখনই স্বয়ং আমাকে পড়াইতেন। এবার আমরা কলিকাতায় আসিলে,

দাদা আর আমাকে পড়াইতে পারিতেন না। দাদার অনুরোধে তিনিই পড়াইতেন। প্রথম প্রথম তাঁহার নিকট পড়িতে যে একটু লজ্জা করিত, ক্রমে তাহা কাটিয়া গেল।

এই সময় এক দিন শুনিলাম, দাদা মাকে বলিতেছেন, "মা, আমার বড় ইচ্ছা, ভবেশের সহিত সুধার বিবাহ হয়।"

মা বলিলেন, "তুমি সারিয়া উঠ; তাহার পর হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি বাচি আর নাই বাচি; ভবেশের সহিত সুধার বিবাহ দিও।"

মা আবার বলিলেন, "তুমি সারিলে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "ভবেশ সুধাকে ভালবাসে। মা, আমি বাঁচিব না। তোমরা ভবেশের সহিত সুধার বিবাহ দিও।"

মা আর কোন কথা কহিলেন না; কেবল অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

দাদার অসুখ সারিল না। তিনি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একদিন শুনিলাম, দাদা তাঁহাকে বলিতেছেন, "ভবেশ, তুমি সুধাকে বিবাহ করিও।" তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তাহার পরে দাদার অসুখ বাড়িয়া উঠিল। আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এত যত্ন—এত শুশ্রূষা, কিছুতেই কিছু হইল না। দাদাকে রাখিতে পারিলাম না। প্রথম শোকবেগ প্রশমিত হইলে আমি ভাবিলাম, দাদার মৃত্যুকালীন অনুরোধ কেহ অবজ্ঞা করিবেন না;—ভগবান বালিকার অবলম্বন লইলেন, কিন্তু আমাকে রমণীর অবলম্বন দিলেন।

সেই সময় বালিকা-হৃদয়ে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল, শেষে তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল। হায়, তখন যদি সে কথা না শুনিতাম,—সেরূপ না বুঝিতাম!

দাদার মৃত্যুর পর বাবা তাঁহার অনুরোধ পালন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভবেশের জ্যেষ্ঠ তখনও অবিবাহিত, তিনি স্বয়ং পরিবার-প্রতিপালনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হয় না; ভবেশের পিতামাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাখিয়া মধ্যম পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। ভবেশ আপনি সংসার চালাইবার উপায় দেখিতে পাইল না।

একদিন ভবেশের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। মা সেদিন কালীঘাটে গিয়াছিলেন। ভবেশ বলিল, "জীবনের সব সুখ-আশা এতদিনে নির্ম্মূল হইয়া গেল।

হিন্দুর ঘরে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই আদর। যদি হিন্দুর ঘরেই জন্মাইলাম, তবে জ্যেষ্ঠ হইয়া জন্মিলাম না কেন? অদৃষ্ট এমনই নিদ্দয়! আমার কথা ভুলিয়া যাও। এই অসীম সংসারে আমার কথা ভাবিবার কেহ নাই। আমি কাহারও দোষ দিই না--দোষ আমার অদৃষ্টের।"

এই কথা কয়টি বলিয়া ভবেশ চলিয়া যাইতেছিল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার চক্ষের জল মুছাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেই আমার জীবনের দ্বিতীয় শোক—সেই আমার বড় বেদনা।

কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা আমাকে বলিলেন, "সুধা, তোর কি অসুখ করিতেছে? অমন দেখাইতেছে কেন?" আমি কাঁদিয়াছিলাম, তাই বোধ করি আমাকে তেমন দেখাইতেছিল। আমি একটা কাজের ছুতায় অন্যত্র গমন করিলাম।

আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া আমরা তীর্থ-দর্শনে বাহির হইলাম।

এই সময় মা প্রায়ই বাবাকে বলিতেন, "মেয়ে যে অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল! আর ঘরে রাখা ভাল দেখায় না।"

বাবা বলিতেন, "দেশে ফিরিয়া বিবাহ দিব।"

আমি এই সকল কথা শুনিতাম, আর কাঁদিতাম।

হরিদ্বারে তোমার সহিত বাবার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল; তোমার সহিত আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। আমার হৃদয়ে নরকযাতনা প্রজ্বলিত হইল।

তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়াই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

* * * * * *

অতুলচন্দ্র যখন এত দূর পড়িল, তখন তাহার পাইক-গণ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিল। অতুলচন্দ্র পত্র রাখিয়া তাহাদিগের নিকট সংবাদ লইতে ব্যস্ত হইল। তাহারা জানাইল যে, বিপক্ষের কোন লোকই আইসে নাই। হাদান ধান কাটিয়া গাড়ী বোঝাই দিয়া লইয়া গিয়াছে, দেখিয়া তাহারা ফিরিয়াছে।

অতুলচন্দ্র ভাবিল, তবে আর কি? সে কেল্লা ফতে, করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

পত্রশেষ।

তাহার পর অতুলচন্দ্র আবার সুধাময়ীর পত্র পাঠ করিতে লাগিল ;—

বিবাহের পর সেই যাতনাময় হৃদয় লইয়া আমি শ্বশুরালয়ে আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম—আমার অদৃষ্টের লিখন বুঝি অদৃশ্যভাবে আমাকে অনুসরণ করিতেছিল—তাই দেখিলাম—ভবেশ!

ইহাও আমার অদৃষ্টের ফল। জানিলাম—ভবেশ কে। আমি এতই স্তম্ভিত হইলাম যে, পিত্রালয়ের কথা ভাবিতেও ভুলিয়া গেলাম। আমি কাঁদি নাই, তাই তোমার বৃদ্ধা মাতামহী বলিয়াছিলেন, "শেয়ানা বৌ, আপনার ঘর চিনিয়াছে। দেখিলে না, বাপের বাড়ীর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল না!"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে তাঁহার নাতিদের সহিত কথা কহিতে আদেশ করিলেন। তোমার অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত ভবেশও আমাকে দেখিতে আসিল। কিন্তু ভবেশ কোনও কথা কহিতে পারিল না। আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল; বুঝি সে তাহা দেখিতে পাইয়াছিল, তাই কি একটা কাজের ছুতায় চলিয়া গেল।

আমি পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়া ভবেশের এক পত্র

পাইলাম। তাহাতে ভবেশ লিখিয়াছিল যে, অদৃষ্টের লিখন যখন অন্যরূপ, অতীতের সকল আশা যখন স্বপ্নমাত্রে পরিণত হইল, তখন আমি যেন সে সকল পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাই, এখন সে সকল কথা যেন কেহ জানিতে না পারে।

সে পত্র পড়িয়া আমি কত কাঁদিলাম—বলিতে পারি না। তখন হইতেই আমি ভবেশকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

তাহার পর আমরা দেশে যাই। আশ্বিন মাসে তুমি আমাকে দেখিতে আসিলে। তাহার পূর্ব্বে তুমি আমাকে পত্র লিখিয়াছিলে, আমিও তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে সকল পত্র কপটতাপূর্ণ।

তুমি যাইবার কিছু দিন পরে আমার এক পিস্‌তুতো ভাই আমাদের বাড়ী আসিলেন। একদিন আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি বাবাকে বলিতেছেন যে, ভবেশ লেখাপড়া ছাড়িয়াছে, এখন কর্ম্মহীন অলসজীবন যাপন করিতেছে। আমি বুঝিলাম—কেন। আমার হৃদয়ে বড় বেদনা বোধ হইল। এই হতভাগিনীর জন্য এত ত্যাগ! জীবনের সব সুখ,—যশোলাভাশা, ধনলাভাশা সকলই ত্যাগ করিয়াছেন! কেন? কেবল আমার জন্য! আমার হৃদয়ের যেটুকু তাঁহার অধিকার করিতে বাকি

ছিল, সেটুকুও অধিকৃত হইয়া গেল। সে কথা ভাবিলে এখন কেবল লজ্জা হয়।

এই সময় হইতেই একবার ভবেশকে দেখিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। আমি তাহাকে জয় করিয়াছি বলিয়া আত্মাভিমানতৃপ্তির জন্য আমি যে তাহাকে দেখিতে চাহিতাম, তাহা নহে। সে একটা প্রবল আকর্ষণ।

ইহার পর আমি শ্বশুরালয়ে গমন করিলাম। এই-বার দেখিলাম, শ্বশুরবাড়ী কি। প্রথমবার নববধূর কেবল আদর, যত্ন; সে আদর, সে যত্ন এত অধিক যে, তাহার মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এবার আমি 'ঘর করিতে' আসিয়াছি; এবার আমার ভাগ্যে উঠিতে বসিতে তিরস্কার—সদাই দারুণ লাঞ্ছনা। শাশুড়ী ঠাকু-রাণীর তীব্র বাক্যবাণ অনেক সময় আমাকে ছাড়াইয়া আমার নিরপরাধ পিতামাতার উপরও বর্ষিত হইত। আমার মনে হইত—সকলেই কি এইরূপ যাতনা সহিয়া স্বামীর ঘর করে?

তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, অনেকে এইরূপ যাতনা সহিয়াই স্বামীর ঘর করে। কেন? তাহারা যে রত্ন পায়, তাহাতে কি আর শাশুড়ীর তির-স্কার বা ননন্দার গঞ্জনা মনে থাকে? তাহারা স্বামীর

ভালবাসা পায়। সে অমূল্য রত্ন আমি হেলায় হারাইয়াছি,—তাই আজ মরণের কূলে তাহার অভাবে কাঁদিতে হইতেছে। তখন তাহা বুঝি নাই;—বুঝিলে জীবনে এ দুর্দ্দশা হইত না। আজ তোমার ভালবাসা পাইলে আমি কি না সহ্য করিতে পারি? আমি সেই ভালবাসার অবমাননা করিয়াছিলাম; তাই আজ তোমার চরণধূলি লইয়া মরিতে পারিলাম না। যে রমণী পতির ভালবাসা পায় না, সে বড় দুঃখিনী; আর যে তাহা পাইয়াও নিজ কর্ম্মদোষে হারায়—সে? তাহার স্থান কোন্ নরকে?

তুমি আমাকে ভাল বাসিতে; আর আমি—পাপীয়সী তোমাকে ঘৃণা করিতাম। তখন কি আমি তোমার ভালবাসা,—জগতে সেই পবিত্রতম রত্ন চিনিতাম? তখন আমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ।

আজ আমি তোমার নিকট কিছু গোপন করিব না। হৃদয়ের এ বোঝা নামাইতে না পারিলে যে মরিতেও পারিব না! তোমার নিকট আত্মদোষ সব না বলিলে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

আমার পাপচিত্তে তখন আর এক পাপচিন্তা উদিত হইল—ভবেশ কেন এখানে আসিবে না? এ তাহার গৃহ; সে এখানে আসিলে কেহ কিছু মনে করিবে না।

তবে সে কেন একবার আসিবে না? আমি ভবেশকে আসিতে লিখিলাম। ভবেশ পত্রের উত্তর দিল না। আমি আবার লিখিলাম, সে তবুও কোন উত্তর দিল না। আমি আবার তাহাকে আসিতে লিখিলাম।

ভবেশ আসিল।

আমার সহিত দেখা হইলে ভবেশ বলিল, "অদৃষ্টের লিখন যখন অন্যরূপ, তখন পূর্ব্বের সকল কথা ভুলিয়া যাও।" সে আমাকে বুঝাইল—তাহাতে উভয়েরই সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা। তখনও কেন তাহা বুঝি নাই? বুঝিলে আজ তোমার প্রেমে এ মরুময় হৃদয় শীতল হইত—এ জীবন সার্থক হইত। হায়, তাহাও হইল না।

তাহার পর ভবেশ চলিয়া গেল।

আমি অভাগিনা বুঝিলাম না; আবার ভবেশকে পত্র লিখিতে লাগিলাম। ভবেশ পত্রের উত্তর দিল না। আমি তাহাকে আমার নাম-লেখা খাম পাঠাইলাম,—পত্র আর কাহারও হাতে পড়িলে, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর দেখিয়া, সে ভাবিবে,—পত্র আমার কোন আত্মীয়ার বা বান্ধবীর লেখা। কয়খানা পত্র লেখার পর ভবেশ একখানা পত্র লিখিল,—সে আবার সেই কথা লিখিল, —"পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাও।" আমি আবার কয়খানা পত্র লিখিলাম; কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না।

আবার কয়খানি পত্র লিখিয়া উত্তর পাইলাম। ভবেশ আবার লিখিল,—"সে সকল কথা ভুলিয়া যাও।" ভবেশ লিখিল,—এখন আমার পক্ষে এ সকল চিন্তাতেও পাপ। হায়, তখনও যদি বুঝিতাম; তাহা হইলে আজ আর এ জ্বালায় জ্বলিতে হইত না; আজ আর আত্মহত্যা, পুত্রহত্যা করিতে হইত না;—এ পাপে আর লিপ্ত হইতে হইত না।

পিত্রালয়ে গিয়া আবার ভবেশকে পত্র লিখিলাম। তাহার উত্তর ভবেশ আমার পিত্রালয়ে লেখে নাই। তুমি সেই পত্র পাইলে;—আমার সর্ব্বনাশের অনল-শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তকাল নিকট হইয়া আসিল।

সেই সময়ই এক একবার আমার মনে হইত,—এ কি করিতেছি? এক একবার আমি ভাবিতাম, পতির গভীর ভালবাসার বিনিময়ে তাঁহাকে কেবল ঘৃণা দিতেছি; কেন এমন করিতেছি? রমণী-জীবনে এ পাপ না করিয়া কেন প্রেমময় পতির প্রেমরাজ্যে ফিরিয়া যাই না?

তাহার পর তুমি আমাকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিলে। তুমি আমাকে সেই পত্রগুলা দিলে। যখন আমি সেগুলা পোড়াইয়া ফেলিলাম, তখন—সেই পত্রগুলার সঙ্গে বুঝি আমার ভ্রমও দূর হইয়া গেল। এত দিনে অন্ধের নয়ন ফুটিল।

সেই পত্রগুলার সঙ্গে আমি আরও কতকগুলা পত্র পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম। এক দিন তোমাকে সেইগুলা দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, সেগুলা তোমারই উদ্দেশে লেখা। তাহা নহে। ভবেশকে পত্র লিখিতে বসিলে কেমন কিছুতেই মনোভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতাম না; হৃদয়ের আকুলতা—আকাঙ্ক্ষা, কেমন ভাষায় প্রকাশিত হইত না। তাই পত্র লিখিয়া কিছুতেই মনের মত হইত না। অনেকগুলা লিখিয়া যেখানা একটু ভাল বোধ হইত, সেইখানাই পাঠাইয়া দিতাম। অবশিষ্ট পত্রগুলা রাখিতাম,—অনেকগুলা জমিলে, এক দিন পোড়াইয়া ফেলিতাম। সে দিন সেই পত্রের কতকগুলা দেখাইয়া, তোমাকে প্রতারিত করিয়াছিলাম।

অন্ধের নয়ন ফুটিল; ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার আশ্রয় ভিন্ন জগতে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন তত দূর আসিয়া ভাবিলাম,—এ কি করিয়াছি! কেন মনোবৃত্তি দমন করিতে শিখি নাই; কেন আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি; কেন তোমাকে এত যাতনা দিয়াছি? কেন আপনি এত যাতনা পাইয়াছি?

হৃদয়ের সে যাতনা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? আমি অহরহঃ মনস্তাপে জ্বলিতে লাগিলাম।

সেই যাতনা ও সেই মর্ম্মব্যথার মধ্যে এতটুকু শান্তি পাইলাম না। মুখ ফুটিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেও পারিলাম না। ভাবিলাম,—কোন্ মুখে তোমার নিকট ক্ষমা চাহিব? কেমন করিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাই যে, আমার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? তুমি কি তাহা বিশ্বাস করিবে?

কিন্তু তুমি আমার স্বামী,—এ জগতে তুমি আমার আরাধ্য দেবতা—তুমি আমার উন্নতির জন্য কি করিয়াছিলে? আমার উন্নতির ও অবনতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কি তোমার উচিত ছিল না? আমার শুভাশুভ—হিতাহিত আমাকে বুঝাইবার তুমি কখনও কোন চেষ্টা করিয়াছিলে কি? তুমি কখনও আমাকে আমার কর্ত্তব্য বুঝাও নাই—শিখাও নাই; কিন্তু আমার কাছে সে কর্ত্তব্যের অধিক প্রত্যাশা করিয়াছ। তবে তুমি আমাকে বিবাহ কর নাই; এই বাহু, এই নয়ন, এই অধর,—এই দেহ বিবাহ করিয়াছিলে। তুমি আমার উন্নতির জন্য কিছু করিলে না।

তাহার পর আমি পিত্রালয়ে যাই। তখন আমার হৃদয়ের সে যাতনার কথা আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব? একবার যদি তুমি ক্ষমা করিতে, একবার যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা-নয়নে চাহিতে, তাহা হইলে

জীবনের সব জ্বালা জুড়াইত—জীবনের স্রোত ভিন্ন-পথপ্রবাহী হইত।

এখন ভাবি,—তখন কি আশায় জীবন রাখিয়াছিলাম? কিন্তু তখন তাহা বুঝি নাই। তখন ভাবিয়াছিলাম,—আমি মরি—মরিব; তোমার সন্তানকে মারিবার আমি কে? নরহত্যা করিব কেন?

তাহার পর, মায়াবন্ধনের উপর মায়াবন্ধন। তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সে চিন্তায় যে কষ্ট. সে কষ্ট সহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম: কিন্তু এই শিশু. কেমন করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া যাইব! সে যেন বড় কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার আমি আশার ছলনায় ভুলিলাম;—ভাবিলাম, তখন তুমি আমাকে চরণে স্থান দাও নাই, এখন দিবে। ইহাকে দেখিলে কি তুমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে? তুমি ইহাকে ভাল বাসিবে; তাহা হইলেই আমার জীবনের জ্বালা জুড়াইবে। আবার আমি আশায় বুক বাঁধিলাম; আবার জীবনের উপর আমার আকর্ষণ জন্মিতে লাগিল।

এমনি আশায় কিছু দিন গেল। তুমি আমার পিত্রালয়ে আসিলে। আমি মনে করিলাম,—এত দিনে আমার দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হইল; তুমি আমাকে মনে করিয়াছ। বড় আশা করিয়া, তোমার কোলে তোমার সন্তানকে

দিতে গিয়াছিলাম। তুমি যাহা বলিলে, হায়! আমাকে তাহা না বলিয়া, কেন আমার বক্ষে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিলে না!

তুমি চলিয়া গেলে। আমি দেখিলাম, আমার আর দাঁড়াইবার স্থান রাখ নাই; মৃত্যু ভিন্ন আমার আর গতি নাই। কিন্তু তোমার এই সন্তান—তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি মরিবার সময় তোমায় মিথ্যা বলিতেছি না—অন্তর্যামী জানেন, এ সন্তান তোমার। এ হতভাগিনীর কথায় তুমি বিশ্বাস করিলে না। কেনই বা করিবে?

কিন্তু আজ আমি বলিতেছি,—ঈশ্বর সাক্ষী—আজ মরিবার সময়, আমার জীবন্ত দেবতা তুমি,—তোমার নিকট মিথ্যা কথা কহিব না;—এ সন্তান তোমার। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না। তবে আমি ইহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব? জগতে ইহার আর কে আছে? পিতা থাকিতেও এ পিতৃহীন। এই জন্যই কি ইহার আশায় এত যাতনা সহিয়াও জীবন রাখিয়াছিলাম? যদি পিতৃগৃহে ইহার স্থান না হয়, তবে আর কোথায় হইবে? শিশু হয় অনাদরে মরিবে, নয় ত বড় হইলে আমাকে,—তাহার জননীকে—চিরদিন অভিসম্পাত করিবে। তুমি যখন ইহাকে লইলে না, তখন আমি ইহাকে কাহার

কাছে রাখিয়া যাইব? আমি ইহাকে লইয়া যাইব। ভগবান্ জানেন, জননী হইয়া আমি কেন সন্তান বধ করিতে যাইতেছি। কেন এ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। আজ বিষে আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে।

আজ আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব, আমি জীবনে কি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি! আমি পাপ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি যে যাতনা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমার অনুতাপের কথা আজ আর কি বলিব?

আমি পাপ করিয়াছি; কিন্তু তুমি ক্ষমা না করিলে নরকেও যে আমার স্থান হইবে না! তোমার চরণে দাসীর এই শেষ প্রার্থনা,—আজ একবার আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া তোমার এই অভাগিনী পত্নীকে ক্ষমা কর।

আজ আমি মরিবার সময় তোমাকে যেমন ভালবাসিয়া মরিতেছি, পরলোকেও যেন তোমাকে তেমনই ভালবাসিতে পারি। আর আজ যদি তোমার চরণ ধ্যান করিয়া মরি, তবে যেন পরজন্মে তোমার "ভালবাসা পাইয়া, মর্ত্ত্যে অমৃতের আস্বাদ পাই। জীবনে যাহাতে নারীজন্মের সার্থকতা, এ জন্মে তাহা হইল না, যেন পরজন্মে হয়, যেন স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া মরিতে পারি; যেন স্বামীর ভালবাসা লইয়া মরিতে পারি"।

একবার আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন জন্মান্তরে তোমার চরণসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অভাগিনী সেবিকা
সুধাময়ী।

অতুলচন্দ্র পত্রখানা রাখিল। যেন হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে যেন হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রান্তে, কোন্ কোণে একটু কেমন বেদনা বোধ হইল; যেন হৃদয়ের কোণে কোথায় একটু আঘাত লাগিল।

একটা মানব-জীবন! মানব যতই পিশাচ হউক না কেন, একটা জীবন-নাশের কথায় তাহার মন একটু বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই আজ অতুল-চন্দ্রও একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিল। মানব যতই অধঃ-পতিত হউক না কেন, ক্রোধে বা লোভে বা মোহে তাহার উচ্চ মনোবৃত্তি সকল যতই সমাচ্ছন্ন হউক না কেন, মানবের মানবত্ব তাহার হৃদয়ে একটু না একটু থাকিয়াই যায়। নহিলে, নরহত্যাকারী দস্যুদিগের মধ্যেও সময় সময় দয়ার কথা শুনা যাইত না। সে দয়া তাহাদের হৃদয়ের সহিত বিজড়িত; তাই তাহা দূর করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। চেষ্টা করিয়াও তাহারা সে দয়া দূর

করিতে পারে না। সকল প্রাণীরই কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকে, সে সকল অধিকার ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে জড়াইয়া যায়—স্বভাবের অংশবিশেষে পরিণত হয়। তাই অতি নিষ্ঠুরও সময় সময় দয়ালুর মত ব্যবহার করে; তাই নরহন্তা দশ বার নরহত্যা করিবার পর, এক বার হত্যাকালে অনুভব করে, যেন কে তাহার হস্ত ধরিয়া রাখিতেছে;—সে যেন আর অস্ত্র নামাইতে পারিতেছে না।

অতুলচন্দ্র ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্য আসিয়া তাহার গাত্রে তৈলমর্দ্দন আরম্ভ করিল।

স্নানাহারের পর, শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, অতুলচন্দ্র আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সুধাময়ার সম্বন্ধায় নানা কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। এই কক্ষ—ইহাতে সুধাময়ীর কত স্মৃতি বিজড়িত! অতুলচন্দ্র যাহাই হউক, মানুষ ত বটে। তাই সে পূর্ব্বকথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। এখন যাহাই হউক, এমন এক সময় ছিল, যখন সে সুধাময়ীকে ভালবাসিত। সেও বড় অধিক দিনের কথা নহে। তাহার মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল। দ্বারদ্বারে সেই পদার্পিতযৌবনা বালিকা—তখন অতুলচন্দ্রের চক্ষে সে মুখখানি মন্দ লাগে নাই। তখন সেই মুখপানে চাহিয়া, সে কত স্বপ্নরচনাই করিয়াছিল। তাহার পর, সে সবই বিফল হইয়াছে। এত আশা, এত

স্বপ্ন, এত কল্পনা, সবই শেষে যাতনার বহ্নিতে ইন্ধন-মাত্র হইয়াছে। আর সেই সুধাময়ী—সে আজ কোথায়?

একবার অতুলচন্দ্রের মনে কেমন বোধ হইল। কিন্তু আত্ম-প্রবোধের অভাব কি? অতুলচন্দ্র আপনাকে বুঝাইল, কে কাহাকে মারিবার কর্ত্তা? অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে? আর—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

ধীর অতুলচন্দ্র তাহাতে বিমোহিত হইবে কেন?

অতুলচন্দ্র ভাবিল, যাহা হইবার, হইয়াছে। কথায় বলে,—

জন্ম, মৃত্যু, পরিণয়,
মানবের হাতে নয়।

ইহাতে কি কাহারও কোনও হাত আছে? দেহী স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করে। এ জগতে কে কাহার কর্ম্মে আবদ্ধ? ভাবিয়া দেখিতে গেলে,—আমি কে, আর এক-জনই বা কে? প্রভাতের রবিকরে ফুল ফুটিল, অপ-রাহ্নের পবনস্পর্শে তাহার দলরাজি ঝরিয়া পড়িল। সে কি পবনের দোষ? সে কি রবিকরের দোষ? সে কি কুসুমের দোষ? কুসুমের পরমায়ু ফুরাইয়াছিল, তাই সে ঝরিল। তাহাতে দোষ কাহার? অতি তুচ্ছ কীট হইতে মানব পর্য্যন্ত কেহই অদৃষ্টের নিয়োগ অতিঃ

ক্রম করিতে পারে না। তবে কাহার কার্য্যের জন্য কে দায়ী?—কেহই নহে।

এইরূপে আত্মপ্রবোধ দিয়া অতুলচন্দ্র আপনাকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিল। তবুও যেন হৃদয়ের কোন্ প্রান্ত হইতে কে বলিতে লাগিল, "তুমি কি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলে? তাহা করিলে কি হইত—কে জানে!"

বুঝি মানবের অধঃপতনের শেষ সীমায়ও তাহার উচ্চ মনোবৃত্তি সকল একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সে সকল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় সত্য; কিন্তু অবসর পাইলেই আবার তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে বিলম্ব করে না। নহিলে, পাপী পাপই করিতে থাকিত;—সে আর কখনও পুণ্যের দিকে ফিরিয়া চাহিত না। পাপ-রত আর কখনও সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পারিত না।

পুত্রবধূর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অতুলচন্দ্রের জননী ভাবিলেন, এবার দেখিয়া শুনিয়া, একটি ধীর মেয়ের সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন।

পরদিবস অতুলচন্দ্র শ্বশুরের এক পত্র পাইল। তাহাতে সে জানিল, সুধাময়ীর পুত্র জীবিত। সুধাময়ী ও তাহার পুত্র উভয়েই মৃত জানিয়া, অতুলচন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিল। এখন এ পত্র পাইয়া ভাবিল, কি করা কর্ত্তব্য? এখন কি করি?

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রাণের বেদনা।

"বাবা, এত কষ্ট সহিয়া কেন একা বিদেশে থাকিবি? দেশে চল্।"

"এখানে আমার কোন কষ্ট নাই।"

"কি সুখ আছে? বাবা, দেশে চল্;—বিবাহ কর্। কি দুঃখে এমন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি? তাহার অপেক্ষা মাকে মারিয়া ফেল্। বাবা, আজ এমন করিবি বলিয়া কি এত কষ্টে তোকে মানুষ করিয়াছিলাম?"

জননী চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন।

ভবেশের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া—রমণী আবার বলিলেন, "আর অমত করিস্ না, বাবা, দেশে চল্।"

সে কয়টি কথা এমন স্নেহভরা, এত করুণ, এত মধুর। জননীর সেই অশ্রু,—সেই পবিত্রতম অশ্রু—এত বেদনাব্যঞ্জক যে, ভবেশ আর চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। জননী সস্নেহে তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন, "ছি—বাবা, কাঁদিস্ নে।" শিশুকে যেমন করিয়া জননী কাঁদিতে বারণ করেন, জননী আজ ভবেশকে তেমনই করিয়া কাঁদিতে বারণ করিলেন। জননীর নিকট সন্তান চিরদিনই শিশু। জননীর স্নেহ

অধঃপতন।

শিশু সন্তানের উপর যেমন অপরিমেয়, বৃদ্ধ সন্তানের উপরও তেমনই অপরিমিত। বয়োভেদে জননীর স্নেহের তারতম্য হয় না।

সেই স্নেহের কথায় ভবেশের অশ্রু দ্বিগুণ বহিল। ভবেশ ভাবিল,—জীবনে কি করিলাম! আপনি ত জ্বলিলাম, আর এই স্নেহময়ী জননী—ইহাকে এত কষ্ট দিলাম! হায়, আমার মত সন্তান জন্মে কেন? মনে এই বেদনা পাইবার জন্যই কি, মা আমার! অনাহারে অনিদ্রায় এত কষ্টে এ নরাধমকে পালন করিয়াছিলে! আমি তোমার কুপুত্র,—আমা হইতে তোমার যাতনা ভিন্ন এক দিনও সুখ হইল না! এ তাপদগ্ধ-জীবনে যে তোমাকে এক দিনের জন্য সুখী করিতে পারিলাম না,—আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শেষে, আমার ব্যবহারে মর্ম্ম-পীড়িতা জননীর নেত্রে অশ্রু দেখাও কপালে ছিল! ইহা অপেক্ষা আমি জন্মমাত্রই মরি নাই কেন? এ জীবনে কি করিলাম! হায়, এ জীবনে কি হইল!

ভবেশ ভ্রাতার বিবাহে যায় নাই। জননী আশা করিয়াছিলেন,—ভবেশ তখন যাইবে। যখন সে গেল না, তখন সেই প্রবাসী সন্তানের জন্য স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কাঁদিল। সেই উৎসবানন্দের মধ্যে মার কেবল

ভবেশের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। বিবাহান্তে মা আপনি ভবেশকে বাড়ী আসিতে লিখিলেন।

তবুও ভবেশ আসিল না।

জননীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারাদিন ভবেশের কথা ভাবিয়া রাত্রিকালে জননী দুঃস্বপ্ন দেখিলেন।

ইহার কয় দিন পরেই পিতার পত্রে ভবেশ অবগত হইল যে, তাহার পিতা মাতা তাহাকে দেখিতে আসিতেছেন।

ভবেশ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সে তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি গোছাইয়া লইল। পিতামাতার জন্য সকল বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু ভবেশের ভাবনা বড় বাড়িতে লাগিল। ভবেশ ভাবিল,—এবার পিতামাতাকে কি বুঝাইব ? তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব ? ভবেশ বড় ভাবিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে ভাবিবার অধিক সময় পাইল না ; দুই দিন পরেই তাহার পিতামাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ছেলেকে দেখিয়াই ভবেশের জননীর চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। এই কি সেই ভবেশ ! অকাল-বার্দ্ধক্য-ভারাবনত, বিষাদবিমলিন এই ভবেশ কি তাঁহার সেই স্নেহের পুত্তলি—সেই আদরের ধন—সেই নয়নানন্দ—সেই হৃদয়-জুড়ান সন্তান ! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

এখন ভবেশকে দেখিলে সহসা চেনা যায় না। ভবেশ দিন দিন একেবারে বৃদ্ধের মত হইয়া পড়িতেছে। তাহার মস্তকে অনেক কেশ শ্বেত হইয়া গিয়াছে; দুই গণ্ডে অস্থি প্রকট হইয়াছে; মুখে যেন হতাশার বেদনার ছায়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। ছেলেকে দেখিয়া, মার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

ভবেশ আসিয়া জনক জননীকে প্রণাম করিল। জননী বহুকষ্টে অমঙ্গল-অশ্রু সংবরণ করিলেন। তাহার পর, ভবেশ জনক জননীকে আপনার গৃহে লইয়া গেল।

ভবেশ 'সাহেবে'র নিকট এক সপ্তাহের ছুটি লইল।

মা আসিয়াই ভবেশের গৃহ গোছাইতে আরম্ভ করিলেন। এ জিনিষটা সরান, ও জিনিষটা ফিরান প্রভৃতিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই গৃহের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে লাগিল। পুরুষ কি কখনও গৃহ সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিতে পারে?—না, জানে? রমণীর করস্পর্শ ভিন্ন গৃহের শ্রী হয় না;—গৃহে শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হয় না। গৃহস্থালীতে রমণীর বিশেষ অধিকার;—গৃহস্থালী জানেন বলিয়াই রমণী সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী। জগতে সর্ব্বত্রই রমণী গৃহের শ্রী-স্বরূপিণী। গৃহিণীপনায় রমণীর বিশেষ অধিকার। এখন রমণী সে কথা ভুলিয়া যাইতেছেন, তাই সংসার শ্রী-হীন হইয়া উঠিতেছে,—সংসারে সুখের

অভাব হইতেছে। যে গৃহে গৃহিণীর গৃহিণীপনা নাই, সে গৃহে শ্রী থাকে না।

বহুকাল পরে জননীর রন্ধন খাইয়া, ভবেশ মনে করিল, যেন সে অমৃতপান করিল।

পর দিবস পিতা মাতাকে লইয়া, ভবেশ ভুবনেশ্বর যাত্রা করিল। গত কল্য সকলে সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মা আজ ভবেশকে বলিতেছেন যে, তাহাকে দেশে যাইতেই হইবে। জননীর স্নেহের কথা শুনিয়া, জননীর অশ্রু দেখিয়া, ভবেশ চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছে না। অথচ সে কিছুই বলিতে পারিতেছে না;—কেন সে দেশে যাইবে না,—কেন তাহার দেশে ফিরিতে ইচ্ছা নাই।

জননী অনেক করিয়া বলিলেন—অনেক বুঝাইলেন। ভবেশ কিছুতেই দেশে ফিরিতে সম্মত হইল না।

মা জগন্নাথের উদ্দেশে মনে মনে বলিলেন,—"ঠাকুর, আমার ছেলের সুমতি হউক, তোমার পূজা দিব।"

* * * * * * *

সমুদ্রের নীল-জলরাশির উপর মধ্যাহ্ন রবিকর জ্বলিতেছে। এখন সমুদ্রের মূর্ত্তি বড় মধুর,—বড় মোহন। মৃদু মধুর সমীর-হিল্লোলে নীলজলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে; আর সেই সব বীচির উপর রবিকর

জ্বলিতেছে। তরঙ্গগুলি তীরের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, আর বেলাভূমে নুড়ি ও নানাবর্ণের কড়ি প্রভৃতি ফেলিয়া সরিয়া যাইতেছে। যেখানে তট-ভূমি সরল নহে, একটু ভাঙ্গিয়াছে, সেখানে নীলজলে একটু শ্বেত ফেন দৃষ্ট হইতেছে। সম্মুখে যত দূর চাহ, কেবল নীলবারি-বিস্তার। উপরে, নীল আকাশের কোলে, দলে দলে জলচর বিহঙ্গম উড়িয়া বেড়াইতেছে;—কখনও নামিতেছে, কখনও উড়িতেছে, চক্রাকারে উড়িয়া উড়িয়া চীৎকার করিতেছে।

জাহাজ লাগিবার ঘাটে একখানা জাহাজের চিম্‌নী দিয়া ঘনকৃষ্ণ ধূমরাশি উঠিয়া পবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাহাজ ছাড়িবার উদ্যোগ চলিতেছে। মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু, টাকমাথা ক্যাপ্টেন ডেকের উপর দাঁড়াইয়া খালাসীদিগের কার্য্য দেখিতেছেন, আর কোনরূপ ত্রুটি দেখিলেই তাহাদিগকে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গলা ও ইংরাজীর খিচুড়ী ভাষায় অভদ্রজনোচিত গালি দিয়া মনের রাগ মিটাইতেছেন। অতিরিক্ত সুরাপানে ক্যাপ্টেনের নাসিকা লোহিতাভ।

অল্পক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন অতি কর্কশ-কণ্ঠে খালাসীদিগকে জাহাজের সিঁড়ি তুলিতে হুকুম দিলেন।

এক জন যুবক তাড়াতাড়ি জাহাজ হইতে নামিয়া গেল। খালাসীরা জাহাজের সিঁড়ি তুলিল। তাহার পর ক্যাপ্টেন জাহাজ ছাড়িতে আদেশ করিলেন। জাহাজের একটিমাত্র

নোঙ্গর ফেলা ছিল। দুই জন খালাসী একখানা চাকা ঘুরাইয়া হড়্ হড়্ শব্দে নোঙ্গর তুলিল। হুস্ হুস্ শব্দে জাহাজ গভীর জলে যাইয়া পড়িল।

যে যুবক জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, সে কিছু পথ একটু বেগে চলিল; তাহার পর, একবার ফিরিয়া জাহাজের দিকে চাহিল। তখন জাহাজ গভীর জলে যাইয়া পড়িয়াছে। সেই সুদূর-প্রসারিত জল-বিস্তারের মধ্যে দূরে জাহাজ ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। কুজ্ঝটিকাহীন, রৌদ্র-দীপ্ত মধ্যাহ্ন—এখনও আকাশে জাহাজের চিম্‌নী হইতে উত্থিত ধূম দৃষ্ট হইতেছে।

সেই জাহাজের দিকে চাহিয়া, ভবেশের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

সেই সময় জাহাজে এক জন রমণী ছলছলনেত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিতেছিল, "ভগবান, আমার পুত্রকে সুমতি দাও।"

ভবেশ এবার অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিতা মাতাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিয়া, সে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিল। চরণ আর যেন চলিতে চাহে না; যেন বিষাদের ও দুঃখের গুরুভারে সে কাতর। তাহার গমন দেখিলে, তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া অনুভব হয়। গৃহে তাঁহার আকর্ষণ কি? জীবনে তাহার আর মমতা

কি? তবে আর তাহার এ ব্যর্থজীবন রাখিয়া ফল কি? কি সুখে, কি আশায়, কি আনন্দে আর সে জীবন রাখিবে?

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া ভবেশ তাহার জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল।

সে স্মৃতিসিন্ধু মন্থন করিয়া হলাহল ব্যতীত আর কি উঠিবে? সেই হলাহলেই তাহার জীবন নিস্তেজ, হৃদয় জর্জ্জরিত। বাল্যজীবন হইতে এ পর্য্যন্ত জীবনের শত ঘটনা—সুখের আশা, দুঃখের তাড়না, আশায় নিরাশা, সুখে বেদনা,—ভবেশ সেই সকল কথা ভাবিতে লাগিল। কোথায় সে সব সুখের স্বপ্ন, আর আজ সে কোথায়! এই দূরদেশে—আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে—সকল উন্নতির আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, সে কি সুখে রহিয়াছে! এখানে তাহার কি আছে;—কে আছে? এখানে আজ সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই; তাহার মুখে জলবিন্দু দিবার কেহ নাই। আজ এই বিদেশে তাহার মৃত্যু হইলে অপরিচিত জনগণ, অশ্রদ্ধায় তাহাকে তাহার চিতা-শয়নে শায়িত করিবে। তাহারা কে? তাহার দেহ যে সাগর-সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, শবভুক্ জলচরের ও বিহঙ্গমের আহারে পরিণত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে

পারে? হইলেই বা কি? এই প্রবাসে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইবার, তাহার মৃত্যুতে একবিন্দু অশ্রু ফেলিবার কে আছে? আজ তাহার সব কোথায়! আর সে কোথায়!

ভাবিতে ভাবিতে ভবেশের নয়ন হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। সে ভাবিল, আমার মত হতভাগ্য বাঁচিয়া থাকে কেন?

সত্য সত্যই হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে ভালবাসিয়া, বক্ষের শোণিতে আমরা যে আশা পুষ্ট করি, সে আশায় নিরাশ হইলে, জীবনে আর কি সুখ, কি আকর্ষণ থাকে? যেন আকর্ষণই থাকে না;—তবুও বাঁচিয়া থাকি কেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জালে ঊর্ণনাভ।

যাহা হউক, অতুলচন্দ্র পুত্রের বিষয়ে কি করিবে, সে ভাবনা ভাবিবার অধিক সময় পাইল না। সেই দিন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর বহির্বাটীতে আসিয়া সে দেখিল, কাছারীঘরের দেওয়ালে একখানা "সমন" লটকান রহিয়াছে। যে জমীদারের বিলেন জমী লইয়া, অতুলচন্দ্র এত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তিনি তাহার নামে নালিশ রুজু করিয়াছেন। আদালতের পেয়াদা মধ্যাহ্নে আসিয়া, তাহার গৃহে "সমন" লট্‌কাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

অতুলচন্দ্র স্বাক্ষী শিখাইতে ও মোকদ্দমার অন্যবিধ তদ্বির করিতে ব্যস্ত হইল। তাহার আর কিছু ভাবিবার অবসর রহিল না।

তাহার পর মোকদ্দমা চলিল।

ভাল জেরার মুখে গ্রাম্যকৃষকের শিখান সাক্ষ্য, বড় অধিকক্ষণ টিকিতে পারে না। অতুলচন্দ্রের পক্ষীয় স্বাক্ষী আলিমামুদ প্রথমে বলিল,—তাহার বড় চাচা জমী করিত, কিন্তু উকিলের জেরায় বাহির হইল যে, পনের বৎসর পূর্ব্বে তাহার বড় চাচার মৃত্যু হইয়াছে। অথচ বিল শুকাইয়াছে বড় জোর পাঁচ ছয় বৎসর। আলি-মামুদ "ভ্যাবা চ্যাকা" হইয়া বোকা বনিয়া গেল।

উকিল হাসিয়া বিচারককে বলিলেন, "হুজুর, এ বড় চমৎকার কথা! বিল শুকাইয়াছে আজ পাঁচ বৎসর, আর সাক্ষীর বড় চাচা মরিয়াছে পনের বৎসর পূর্ব্বে; অথচ সে ঐ স্থানে 'জমী করিত'! সে কি জলের উপর ভাসমান উদ্যানের রচনা করিয়াছিল? শুনিয়াছি, কাশ্মীরে সেরূপ উদ্যান আছে।"

বিচারক বলিলেন, "উহার সাক্ষ্য লইয়া আর কাজ নাই।"

তাহার পর সোনাই মণ্ডল জামগাছের দোহাই দিল। উকীলের জেরায় প্রকাশ পাইল, যে জমীতে জাম গাছ আছে, সে জমী বিলেন জমীর সামিলই নহে, বিলের উপর; সুতরাং সে জমীর সহিত বিলের 'উঠিৎ' জমীর কোন সম্বন্ধই নাই। তাহার পর, তাহার "এট্টুক ব্যালা হতি' জামপাড়ার কথা লইয়া, উকিলের একটু রহস্য করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি জেরায় প্রমাণ করিলেন যে, কেবল সাত বৎসর পূর্ব্বে সোনাই সে 'জমার ফলকর তলকর ইত্যাদি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহিবার' অধিকার পাইয়াছে; তৎপূর্ব্বে জমা হানিফ শেখের ছিল। উকীলের জেরায় সোনাই বলিল, "তাহার বয়স দু কুড়ি এক বৎসর।" উকীল বলিলেন, "হুজুর! এ লোকটার বয়স একচল্লিশ বৎসর। এ জমা এ

সাত বৎসর মাত্র লইয়াছে; অথচ নিজেই স্বীকার করিতেছে যে, 'এটুক ব্যালা হতি' ঐ গাছের জাম পাড়ে, আর মনিব বলিয়া, ধামা বোঝাই করিয়া আসামীর বাড়ী দিয়া আসে। এই সাত বৎসরের পূর্ব্বে সে বরাবর পরের গাছের জাম চুরি করিত, আর আসামী 'চোরাই মাল' জানিয়াও তাহা লইয়া ইহার সহ-কারিতা করিত। ইহারা যে ইতিপূর্ব্বেই চুরির অপরাধে মোকদ্দমায় পড়ে নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতে যে পুলিশের সহকারিতা ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তাহার পর—"

উকীল আরও বলিতে যাইতেছিলেন। বিচারক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া বৃথা আদালতের সময় নষ্ট করিবেন না। এ সকল কথায় কোনও প্রয়োজন নাই। ইহার আর সাক্ষ্য অনাবশ্যক। অপর সাক্ষীকে তলব করা যাউক।" উকীল বিবক্ষু রসনার বেগ সংবরণ করিলেন। চাপরাসী হাঁকিল,— "ছিদাম মণ্ডল হাজির? সাক্ষী ছিদাম মণ্ডল হাজির?"

স্কন্ধে গামছা ছিদাম মণ্ডল আসিয়া কাঠগড়ায় উঠিল, ও বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে বিচারককে প্রণাম করিল।

ছিদাম মণ্ডল অতি অল্পেই গোলমাল করিয়া ফেলিল; সুতরাং তাহার সাক্ষ্যও গেল।

এইরূপে একে একে অতুলচন্দ্রের সাক্ষীরা জেরার মুখে প্রবল ঝড়ে কলাগাছের মত পড়িতে লাগিল। শেষ স্বাক্ষী দুঃখীরাম। পলিতকেশ বৃদ্ধ আসিয়া কাঠ্‌-গড়ায় দাঁড়াইল।

প্রথমে বৃদ্ধ তোতা পাখীর মত খানিকটা শিখান কথা বলিল। তাহার পর, উকীলের জেরায় একটা কথা বলিতে না বলিতে, তাহার মুখে আর বাক্য সরিল না। উকীল ভাবিলেন,—এই সুযোগ; স্বাক্ষী ভয় পাইয়াছে; জোরে তাড়া করিলে ফল হইবে। উকীলের সতেজ তাড়ায় বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল; বৃদ্ধ পড়িয়া গেল। কাঠগড়ার রেলে লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

বিচারকের আদেশে দুই জন চাপরাসী বৃদ্ধের মুখে চখে জল দিয়া, তাহাকে ধরাধরি করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। সেইখানেই ধর্ম্মভীরু দুঃখীর জীবন শেষ হয়।

এই সকল প্রমাণসত্ত্বেও আইনের তর্কে অতুলচন্দ্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা টিকিল না। কারণ জমীতে যে ধান বুনিয়াছিল, সেই কাটিয়া লইয়াছে। হাদুর অতুলচন্দ্রের প্রজা, এবং অতুলচন্দ্রের প্ররোচনাতেই সে এ কার্য্য করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে ফৌজদারী মোক-

দ্দমা টিকে না। বিশেষতঃ মোকদ্দমায় হাদানকেই আসামী করা উচিত ছিল।

মোকদ্দমায় খালাস পাইয়া, গৃহে ফিরিয়াই অতুলচন্দ্র দুঃখীর বিধবা পত্নীকে ভিটা হইতে তাড়াইল। অভাগিনী পুত্রকন্যা লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহত্যাগ করিল।

এ দিকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিফল-মনোরথ হইয়া, বিলের মালিক-জমীদার অতুলচন্দ্রের নামে দেওয়ানী নালিশ রুজু করিলেন।

সেরেস্তার পুরাতন চিঠা দৃষ্টে স্বত্ব স্থির হইয়া গেল। অতুলচন্দ্রের এত শ্রম পণ্ড হইল। আবার ফৌজদারী মোকদ্দমায় সপ্রমাণ হইয়াছিল যে, হাদান অতুলচন্দ্রের প্রজা, এবং তাহারই প্ররোচনায় বিলের জমীতে ধান বুনিয়াছিল। এবার কিছুতেই কিছু হইল না। অতুলচন্দ্রের নামে ক্ষতি-পূরণ প্রভৃতির বাবদ অনেক টাকার 'ডিক্রী' হইল।

মোকদ্দমা হাইকোর্ট অবধি গড়াইল। অতুলচন্দ্রের বাল্য-বন্ধু উকীল্ যোগেন্দ্রবাবু তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, এবং উকীল-সুলভ-বাগাড়ম্বরের সহিত নানা নজির হাজির করিয়া, জজদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। যোগেন্দ্র বাবু অনেক বকিলেন, অনেক হাত নাড়িলেন, অনেকবার 'My Lord'-দিগকে তাঁহার মক্কে-

লের স্বত্বের বিষয়ে 'নিঃসন্দেহ প্রমাণ' দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে নিম্ন-আদালতের রায়ই বাহাল রহিল।

ঊর্ণনাভ শেষে আপনার জালে আপনিই বিজড়িত হইল।

অগত্যা অতুলচন্দ্রকে বিলেন জমীর আশা ছাড়িতে হইল, এবং আক্কেলসেলামীস্বরূপ কয় গোলা ধান্য বিক্রয় করিয়া ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিতে হইল।

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল,—এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠে, কলি এখনও পূর্ণ হয় নাই; ইহার মধ্যেই কি ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান হইবে! পাপের শাস্তি হইবেই হইবে।

উপসংহার

ঝটিকার পর।

উপসংহার।

নববেশ।

হাইকোর্টের মোকদ্দমা শেষ হইলে, অতুলচন্দ্র একেবারে ভেল বদলাইয়া ফেলিল। এবার সে গোঁড়া হিন্দু সাজিল।

সে বাল্যবিবাহ, বৈধব্য-পালন, হাঁচি-টিক্‌টিকি, এমন কি, বহুবিবাহ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। জীবনের একটা দুর্ঘটনা হইতে নারীজাতির প্রতি তাহার আন্তরিক অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, একটু সুবিধা পাইলেই কুলপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীরা পিঞ্জর ত্যাগ করিবে; তাহারা কেবল তজ্জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। সুতরাং অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর, বার-ব্রত, উপবাস সে যত পালন করে, ততই ভাল; কেন না, তাহাতে সংযমশিক্ষা হয়। অন্তঃপুরে যাহাতে আর কোন পুরুষের পাপদৃষ্টি প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য; কেন না, রমণীকে বিশ্বাস নাই।

গ্রামে এক হরিসভার প্রতিষ্ঠা করিয়া, অতুলচন্দ্র তাহাতে বার্ষিক আট আনা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল। তদ্ভিন্ন গ্রামে কোন ব্যাধির প্রকোপ প্রকাশ হইলেই

সে চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারী পূজা করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন দুষ্ট লোক বলিত যে, প্রতিবার বারোয়ারী পূজায় তাহার কিছু কিছু লাভ হয়।

অতুলচন্দ্র শ্মশ্রু-মুণ্ডন করিয়া ফেলিল, এবং মস্তকে একটা বড় রকমের টিকি রাখিল। এমন সাধু ব্যক্তি যে বারোয়ারী পূজার চাঁদায় আত্মোপকার সাধন করিবেন, এমন কথা নিতান্ত বিশ্বনিন্দুক ব্যতীত আর কে বলিতে পারে?

আর সকলে যাহাই ভাবুন, অতুলচন্দ্রের প্রজারা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিত না যে, তাহার কিছুমাত্র ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল। সে অঞ্চলে প্রজা-পীড়ক বলিয়া তাহার বড় অখ্যাতি ছিল। কিন্তু অতুলচন্দ্র সে অখ্যাতির ভয় করিত না। তাহার এক বন্ধু এক বার তাহাকে [illegible], সে তাহাকে বলিয়াছিল,— "[illegible] ক্ষণ-স্থায়ী। মানব আজ আইসে, [illegible] অ[illegible] দিকে চাহিয়া ফল [illegible] করিয়া যাওয়াই [illegible] কার্য্যের কথা কহি- [illegible] আমি কে? আমার কি [illegible] কোনও কার্য্য করি! [illegible] আমি তাহাই করি।